প্যারাডক্সিক্যাল
সাজিদ
আরিফ আজাদ

২০১৭-২০১৮ সালের রকমারি
ডটকম বেস্ট-সেলিং বই

প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ

আরিফ আজাদ

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

✍ প্রকাশকের কথা

সভ্যতার শুরু থেকেই সত্য ও মিথ্যার ধারাবাহিক লড়াই। মানবতার সমাধানে ইসলাম বরাবরই জাহেলিয়াতের ধারক-বাহকদের অপপ্রচার ও বিদ্বেষ মোকাবিলা করে আসছে। আধুনিক সভ্যতার এই সময়ে দাঁড়িয়েও সেই ধারা অব্যাহত আছে। সোশ্যাল মিডিয়ার ক্রমবর্ধমান পরিসরকে ব্যবহার করে ইসলাম বিদ্বেষী মহল সুকৌশলে তরুণ প্রজন্মের চিন্তার রাজ্যে সন্দেহের বীজ বোপন করছে। সন্দেহ থেকে সংশয়, সংশয় থেকে অবিশ্বাস। এভাবে এক অবিশ্বাসী প্রজন্মের গোঁড়াপত্তন হচ্ছে কি-বোর্ডে। কিছু অযাচিত বুলি শিখে, প্রশ্নের ডালি নিয়ে তারা ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বাসীদের সুশৃঙ্খল চিন্তার দুনিয়ায়। কিছু কিছু তরুণ-যুবা দিকভ্রান্তও হচ্ছে। রক্তক্ষরণ হচ্ছে মুসলিম মিল্লাতে। অবিশ্বাসীদের আপাত চমকপ্রদ প্রশ্ন ও চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় হিমশিম অবস্থা। জাহেলিয়াতের চ্যালেঞ্জ যেখানে, সেখানেই বিশ্বাসী প্রাণের যৌক্তিক লড়াই। এমনই এক বিশ্বাসী তরুণ আরিফ আজাদ। অনলাইন দুনিয়ায় অবিশ্বাসীদের উত্থিত প্রশ্নের সাবলীল উত্তর দিয়ে অজস্র মানুষের প্রিয়ভাজন হয়েছেন। একজন তরুণ এত চমৎকার ও যৌক্তিক ভাষায় ইসলাম বিরোধীদের জবাব দিতে পারেন, ভাবতেই আশাবাদী মন জানান দেয়– আগামীর দিন শুধু সম্ভাবনার। 'প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ' বইটিতে গল্প ও সাহিত্যরস দিয়ে অবিশ্বাসীদের নানান প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে।

অনুভব করেছি, আরিফ আজাদের কথাগুলো অনলাইন দুনিয়ার পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যের বাস্তব দুনিয়ায়ও থাকা উচিত। নাস্তিক্যবাদ ও ইসলাম বিদ্বেষীদের অপপ্রচারের জবাবে অনেকেই লিখছেন, বলছেন। এই বইটি সেসব জবাবের ভিত্তিকে আরও মজবুত করবে। আমার বিশ্বাস বইটি তরুণ প্রজন্মের মনোজগতে এক তুমুল আলোড়ন তুলবে। আশা করি বইটি পড়ে অবিশ্বাসীরাও নির্মোহভাবে ইসলাম নিয়ে চিন্তা করবেন।

'গার্ডিয়ান পাবলিকেশন' এই অসাধারণ বইটি প্রকাশ করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখাগুলোকে পাণ্ডুলিপি আকারে পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়ার কাজটা অনেক বড়ো চ্যালেঞ্জের। বইটিকে যথাসম্ভব সুন্দর ও নিঁখুত করতে আন্তরিকতা ও পরিশ্রমের কোনো ত্রুটি ছিল না। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ আমাদের যোগ্যতা ও সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় নিয়ে ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে বিশ্বাস করছি।

লেখকের স্বকীয়তা এবং ভাষার বৈচিত্র বিবেচনায় প্রয়োজনে ইংরেজি শব্দও ব্যবহার করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নজর দেওয়া সত্ত্বেও কিছু ত্রুটি থেকে যেতে পারে। যেকোনো সংশোধনীকে আমরা স্বাগত জানাব। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে আরও সুন্দর ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করব- ইনশাআল্লাহ।

সম্মানিত লেখকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বইটি আমাদের বিশ্বাসের প্রাচীরকে আরও মজবুত করুক। ছড়িয়ে পড়ুক বিশ্বাসের কথা প্রতি জনে, প্রতি প্রাণে।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭
বাংলাবাজার, ঢাকা।

✍ লেখকের কথা

সময় পালটেছে। পালটেছে যুগ আর মানুষের চাহিদা। সাথে সাথে মানুষের মধ্যে জানার আকাঙ্ক্ষাটাও বেড়েছে অনেক। পরিবেশ, সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম সবকিছু নিয়ে আমরা এখন সদা তৎপর। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলছি সবাই। এই চলার পথে নানান মানুষের, নানান মতের সাথে পরিচিত হচ্ছি প্রতিনিয়ত। এই মত, পালটা মতের বিচার-বিশ্লেষণ, দ্বন্দ্ব-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কারও বিশ্বাস পালটে যাচ্ছে, কারও বা সুদৃঢ় হচ্ছে আগের চেয়ে। এমনই সময়ের বাঁকে, ইন্টারনেট আর প্রযুক্তির কল্যাণে আমরা নতুন অনেক কিছুই জানছি, যা হয়তো আগে জানতাম না। এই জানাটা আমাদের কাউকে আত্মবিশ্বাসী করছে, কাউকে করছে সংশয়বাদী। প্রতিনিয়ত মনের মধ্যে জন্ম নিচ্ছে নানান প্রশ্ন। মাথার মধ্যে ঘুরপাক খায়, কিলবিল করে এসব প্রশ্ন। 'এটা কি সত্যিই এরকম? এটা এমন কেন? এটা আসলে কী হতে পারে?' এই জাতীয় নানান রকম প্রশ্নবাণে আমরা প্রায়ই জর্জরিত হই।

তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করতে গিয়ে আমি নিজেও এসবের মুখোমুখি হই। এসবের উত্তর খুঁজতে নিজেকে ডুবিয়ে রাখি। জ্ঞানরাজ্যে পদার্পণ করি জানার, শেখার আশায়।

একসময় ভাবলাম, এই প্রশ্নগুলো তো আমার একার নয়, আমার মতো অনেকের। আমি যতটুকু জেনেছি আর বুঝেছি তা অন্যদের জানিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য। এই কর্তব্য পালন করতে গিয়ে একসময় কলম হাতে নেমে পড়ি। আমি সম্পূর্ণ জানি না। অনেক কিছুই আমার অজানা। তবে, যেটুকু আমি জেনেছি তা অন্যদের জানাতে আমি সামনে নিয়ে এলাম 'সাজিদ'-কে। সাজিদ তার সাধ্যমতো প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে চেষ্টা করে। সাজিদ জানে তার অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। তবুও সে তার সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে বলে যায়। এভাবেই সাজিদ এগিয়ে যায়।

লেখাগুলো কখনো মলাটবদ্ধ হবে তা আমি ভাবিনি। এই লেখা মলাটবদ্ধ হওয়ার পেছনে যার অনুপ্রেরণা, ভালোবাসা আর সহযোগিতা অপরিসীম, সেই শ্রদ্ধেয় নাসির ভাইকে অন্তরের অন্তস্তল থেকে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। নবীন একজন লেখকের বই প্রকাশ করে 'গার্ডিয়ান পাবলিকেশন' আমাকে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। লেখালেখির মূল অনুপ্রেরণা সম্মানিত পাঠকবৃন্দকে বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এই প্রয়াসটুকু যাদের জন্য, বইটি যদি তাদের সামান্য উপকারেও আসে, তবেই আমার-আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

আরিফ আজাদ
চট্টগ্রাম

পাঠক প্রতিক্রিয়া

'সাজিদ সিরিজ' আমার খুবই প্রিয় একটা সিরিজ। কেন? কারণ, যখন বাংলাদেশে চারদিকে মুক্তবুদ্ধির চর্চা, বিজ্ঞান ও বিবর্তনবাদের নাম করে আল-কুরআন, ইসলাম ধর্ম ও মুহাম্মাদ (সা.)-কে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও কুরুচিপূর্ণ ভাষায় আক্রমণ করা হচ্ছে, ঠিক তখনই আরিফ আজাদের 'সাজিদ সিরিজ' তাদের মোক্ষম জবাব হিসেবে হাজির হলো। সাজিদের ভাষা সমসাময়িক, প্রাঞ্জল ও মনোমুগ্ধকর। তার উপস্থাপন লজিক্যাল, তথ্যপূর্ণ ও বিজ্ঞানভিত্তিক।

→ আবু সাঈদ ওবায়দুল্লাহ
কবি

লেখক আরিফ আজাদ এবং তার সৃষ্ট সাজিদ চরিত্রের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমার পরিচয়। শুরু থেকেই এ চরিত্রটি আমাকে মুগ্ধ করতে থাকে। সাজিদের মধ্য দিয়ে লেখক মানবিক ও মানসিক দ্বন্দ্ব দূর করে স্রষ্টার একক ও সর্বোচ্চ সত্তার সত্যায়ন, প্রচলিত মতভেদ ও ধ্যান-ধারণার সর্বাধুনিক নিষ্পত্তিকরণের কাজ করলেও এটিকে কেবল 'ধর্মীয়' তকমা দিয়ে উপসংহারে পৌঁছানো যাবে না। প্রতিটা বিষয়ের অবতারণা, উপস্থাপনা ও যুক্তিতর্ক এতটাই সাবলীল ও সুখপাঠ্য যে সাহিত্যের বিচারেও তার উৎকর্ষতা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। সাজিদকে যদি কোনো গল্প-উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রে বসিয়ে লেখক কাল্পনিক ঘটনার পরম্পরা সাজাতেন, তবুও তা সমাদৃত হতো বলেই আমার বিশ্বাস। এমনকী সাজিদের আশপাশের চরিত্রগুলোর আবেদনও কম নয়। তাদের দিয়ে মূল আবহটা তৈরি করার পর সাজিদকে সামনে এনেছেন। সাজিদ চরিত্রের আশ্রয়ে লেখক যেন নিজেকে প্রকাশ করেছেন বারবার। 'প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ' সংকীর্ণতা, মূর্খতা ও অসত্যের ঢাকনা খোলার যুতসই চাবি।

→ সোহেল নওরোজ
বিশিষ্ট গল্পকার

কৈশোর থেকেই স্রষ্টা, জীবনের উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিষয়ে আমার মনে নানা প্রশ্ন আসত। প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে পেতে বিভিন্ন ধরনের বই ঘাটতাম এবং চিন্তা করতাম। পড়তে গিয়ে কোনো প্রশ্নের উত্তর পেলে সবসময় মনে হতো এ বিষয়গুলোকে যদি প্রাণবন্ত করে গল্পের আকারে উপস্থাপন করা যায়, তাহলে আমার মতো যারা বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করছেন, তাদের জন্য সহজ হতো। আরিফ আজাদ যেন আমার মনের সেই আকাঙ্ক্ষাকেই বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। আরিফের লেখনী অত্যন্ত ক্ষুরধার এবং উপস্থাপনশৈলী চমৎকার। আল্লাহ তার কলমকে অবিশ্বাসীদের অপপ্রচার অপণোদনে আরও বেশি শক্তিশালী করে তুলুন।

→ আবদুল্লাহ সাঈদ খান
এমবিবিএস, ঢাকা মেডিকেল কলেজ

সূচিপত্র

একজন অবিশ্বাসীর বিশ্বাস	১১
তাকদির বনাম স্বাধীন ইচ্ছা : স্রষ্টা কি এখানে বিতর্কিত	১৮
স্রষ্টা কেন মন্দ কাজের দায় নেন না	২৬
শূন্যস্থান থেকে স্রষ্টার দূরত্ব	৩২
তাদের অন্তরে আল্লাহ মোহর মেরে দেন : সত্যিই কি তাই	৪০
মুশরিকদের যেখানেই পাও হত্যা করো... অতঃপর	৪৬
স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করল	৫২
একটি সাম্প্রদায়িক আয়াত এবং...	৫৯
কুরআন কি সূর্যের পানির নিচে ডুবে যাওয়ার কথা বলে	৬৪
মুসলমানদের কুরবানি ঈদ এবং একজন মাতুব্বরের অযাচিত মাতব্বরি	৭১
আল-কুরআন কি মানবরচিত	৭৯
রিলেটিভিটির গল্প	৮৭
A Letter to David: Jessus Wasn't Myth & He Existed	৯৪
কুরআন, আকাশ, ছাদ এবং একজন ব্যক্তির মিথ্যাচার	১০৩
আয়িশা (রা.) ও মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিয়ে এবং কথিত নাস্তিকদের কানাঘুষা	১০৯
কুরআন কি মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিজের কথা	১১৭
স্রষ্টা যদি দয়ালুই হবেন, তাহলে জাহান্নাম কেন	১২৩
কুরআন মতে পৃথিবী কি সমতল না গোলাকার	১২৮
একটি ডিএনএ'র জবানবন্দি	১৩৬
কুরআনে বিজ্ঞান : কাকতালীয় নাকি বাস্তবতা	১৪৬
স্রষ্টা কি এমন কিছু বানাতে পারবে, যেটা স্রষ্টা নিজেই তুলতে পারবে না	১৫৩
ভেল্কিবাজির সাতকাহন	১৬১

একজন অবিশ্বাসীর বিশ্বাস

আমি রুমে ঢুকেই দেখি সাজিদ কমপিউটারের সামনে উঁবু হয়ে বসে আছে। খটাখট কী যেন টাইপ করছে। আমি জগ থেকে পানি ঢালতে লাগলাম। প্রচণ্ড রকম তৃষ্ণার্ত। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাওয়ার জোগাড়। সাজিদ কমপিউটার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল- 'কি রে, কিছু হইল?'

আমি হতাশ গলায় বললাম- 'নাহ।'

'তার মানে তোকে এক বছর ড্রপ দিতেই হবে?' সাজিদ জিজ্ঞেস করল।

আমি বললাম, 'কী আর করা। আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যই করেন।'

সাজিদ বলল- 'তোদের এই এক দোষ, বুঝলি? দেখছিস পুওর অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য এক বছর ড্রপ খাওয়াচ্ছে, তার মধ্যেও বলছিস, আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যই করেন। ভাই, এইখানে কোন ভালোটা তুই পাইলি,বলত?'

সাজিদ সম্পর্কে কিছু বলে নেওয়া দরকার। আমি আর সাজিদ রুমমেট। সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাইক্রোবায়োলজিতে পড়ে। প্রথম জীবনে খুব ধার্মিক ছিল। নামাজ-কালাম করত। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে কীভাবে কীভাবে যেন এগনোস্টিক হয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে স্রষ্টার ওপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে এখন পুরোপুরি নাস্তিক হয়ে গেছে। ধর্মকে এখন সে আবর্জনা জ্ঞান করে। তার মতে, পৃথিবীতে ধর্ম এনেছে মানুষ। আর 'ঈশ্বর' ধারণাটাই এই রকম স্বার্থান্বেষী কোনো মহলের মস্তিষ্কপ্রসূত।

সাজিদের সাথে এই মুহূর্তে তর্কে জড়ানোর কোনো ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু তাকে একদম ইগনোর করেও যাওয়া যায় না।

আমি বললাম- 'আমার সাথে তো এর থেকেও খারাপ কিছু হতে পারত, ঠিক না?'

'আরে, খারাপ হওয়ার আর কিছু বাকি আছে কি?'

'হয়তো।'

'যেমন?'

'এরকমও তো হতে পারত, ধর, আমি সারা বছর একদমই পড়াশোনা করলাম না। পরীক্ষায় ফেইল মারলাম। এখন ফেইল করলে আমার এক বছর ড্রপ যেত। হয়তো ফেইলের অপমানটা আমি নিতে পারতাম না। আত্মহত্যা করে বসতাম।'

সাজিদ হা হা হা হা করে হাসা শুরু করল। বলল- 'কী বিদঘুটে বিশ্বাস নিয়ে চলিস রে ভাই।'

এই বলে সে আবার হাসা শুরু করল। বিদ্রুপাত্মক হাসি।

রাতে সাজিদের সাথে আমার আরও একদফা তর্ক হলো।

সে বলল- 'আচ্ছা, তোরা যে স্রষ্টায় বিশ্বাস করিস, কীসের ভিত্তিতে?'

আমি বললাম- 'বিশ্বাস দু-ধরনের। একটা হলো, প্রমাণের ভিত্তিতে বিশ্বাস। অনেকটা শর্তারোপে বিশ্বাস বলা যায়। অন্যটি হলো, প্রমাণ ছাড়াই বিশ্বাস।'

সাজিদ হাসল। সে বলল- 'দ্বিতীয় ক্যাটাগরিকে সোজা বাংলায় অন্ধ বিশ্বাস বলে রে আবুল, বুঝলি?'

আমি তার কথায় কান দিলাম না। বলে যেতে লাগলাম-

'প্রমাণের ভিত্তিতে যে বিশ্বাস, সেটা মূলত বিশ্বাসের মধ্যে পড়ে না। পড়লেও, খুবই ট্যাম্পোরারি। এই বিশ্বাস এতই দুর্বল যে, এটা হঠাৎ হঠাৎ পালটায়।'

সাজিদ এবার নড়েচড়ে বসল। সে বলল- 'কীরকম?'

আমি বললাম- 'এই যেমন ধর, সূর্য আর পৃথিবীকে নিয়ে মানুষের একটি আদিম কৌতূহল আছে। আমরা আদিকাল থেকেই এদের নিয়ে জানতে চেয়েছি, ঠিক না?'

'হু, ঠিক।'

'আমাদের কৌতূহল মেটাতে বিজ্ঞান আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে, ঠিক?'

'হ্যাঁ।'

'আমরা একাট্টা ছিলাম। আমরা নির্ভুলভাবে জানতে চাইতাম যে, সূর্য আর পৃথিবীর রহস্যটা আসলে কী। সেই সুবাধে, পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা নানান সময়ে নানান তত্ত্ব আমাদের সামনে এনেছেন। পৃথিবী আর সূর্য নিয়ে প্রথম ধারণা দিয়েছিলেন গ্রিক জ্যোতির্বিজ্ঞানি টলেমি। টলেমি কি বলেছিল, সেটা নিশ্চয় তুই জানিস?'

সাজিদ বলল- 'হ্যাঁ। সে বলেছিল সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে।'

'একদম তাই। কিন্তু বিজ্ঞান কি আজও টলেমির থিওরিতে বসে আছে? নেই। কিন্তু কি জানিস, এই টলেমির থিওরিটা বিজ্ঞান মহলে টিকে ছিল পুরো ২৫০ বছর। ভাবতে পারিস? ২৫০ বছর পৃথিবীর মানুষ, যাদের মধ্যে আবার বড়ো বড়ো বিজ্ঞানী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ছিল, তারাও বিশ্বাস করত যে, সূর্য পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে। এই ২৫০ বছরে তাদের মধ্যে যারা যারা মারা গেছে, তারা এই বিশ্বাস নিয়েই মারা গেছে যে, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে।'

সাজিদ সিগারেট ধরাল। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল- 'তাতে কী? তখন তো আর টেলিস্কোপ ছিল না, তাই ভুল মতবাদ দিয়েছে আর কী। পরে নিকোলাস কোপারনিকাস এসে তার থিওরিকে ভুল প্রমাণ করল না?'

'হ্যাঁ। কিন্তু কোপারনিকাসও একটা মস্তবড়ো ভুল করে গেছেন।'

সাজিদ প্রশ্ন করলো- 'কীরকম?'

'অদ্ভুত! এটা তো তোর জানার কথা। যদিও কোপারনিকাস টলেমির থিওরির বিপরীত থিওরি দিয়ে প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন যে, সূর্য পৃথিবীর চারপাশে নয়; বরং পৃথিবীই সূর্যের চারপাশে ঘুরে। কিন্তু তিনি এক জায়গায় ভুল করেন এবং সেই ভুলটাও বিজ্ঞান জগতে বীরদর্পে টিকে ছিল গোটা পঞ্চাশ বছর।'

'কোন ভুল?'

'উনি বলেছিলেন, পৃথিবীই সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে, কিন্তু সূর্য ঘুরে না। সূর্য স্থির। কিন্তু আজকের বিজ্ঞান বলে- নাহ, সূর্য স্থির নয়। সূর্যও নিজের কক্ষপথে অবিরাম ঘুরছে।'

সাজিদ বলল- 'সেটা ঠিক বলেছিস। কিন্তু বিজ্ঞানের এটাই নিয়ম যে, প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হবে। এখানে শেষ বা ফাইনাল বলে কিছু নেই।'

'একদম তাই। আমিও জানি, বিজ্ঞানে শেষ বা ফাইনাল বলে কিছু নেই। একটা বৈজ্ঞানিক থিওরি ২ সেকেন্ডও টিকে না, আবার আরেকটা ২০০ বছরও টিকে যায়।

তাই প্রমাণ বা দলিল দিয়ে যা বিশ্বাস করা হয়, তাকে আমরা বিশ্বাস বলি না। এটাকে আমরা বড়োজোর চুক্তি বলতে পারি। চুক্তিটা এরকম- 'তোমায় ততক্ষণ বিশ্বাস করব, যতক্ষণ তোমার চেয়ে অথেনটিক কিছু আমাদের সামনে না আসছে।'

সাজিদ আবার নড়েচড়ে বসল। এবার সে কিছুটা একমত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

আমি বললাম- 'ধর্ম বা সৃষ্টিকর্তার ধারণা/অস্তিত্ব ঠিক এর বিপরীত। তুই দ্যাখ, বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের মধ্যকার এই গূঢ় পার্থক্য আছে বলেই আমাদের ধর্মগ্রন্থের শুরুতেই বিশ্বাসের কথা বলা আছে। পবিত্র কুরআনুল কারিমের সূরা বাকারার দুই নম্বর আয়াতে বলা আছে- "এটা তাদের জন্য যারা বিশ্বাস করে।"

যদি বিজ্ঞানে শেষ বা ফাইনাল কিছু থাকত, তাহলে হয়তো ধর্মগ্রন্থের শুরুতে বিশ্বাসের বদলে বিজ্ঞানের কথাই বলা হতো। হয়তো বলা হতো- "এটা তাদের জন্যই যারা বিজ্ঞানমনস্ক।"

কিন্তু যে বিজ্ঞান নিজেই সদা পরিবর্তনশীল, যে বিজ্ঞানের নিজের ওপর নিজেরই বিশ্বাস নেই, তাকে কীভাবে অন্যরা বিশ্বাস করবে?'

সাজিদ বলল- 'কিন্তু যাকে দেখি না, যার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই, তাকে কী করে আমরা বিশ্বাস করতে পারি?'

'সৃষ্টিকর্তাকে কি তাহলে বিজ্ঞান দিয়ে জাজ করতে হবে? বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা নেই? নাকি থাকতে নেই?' আমি বললাম।

'বিজ্ঞানের আবার সীমাবদ্ধতা কী? হ্যাঁ, আজকে বিজ্ঞান হয়তো কিছু একটা আমাদের জানাতে পারছে না। তার মানে কিন্তু এই না যে, ইন ফিউচারে বিজ্ঞান সেটা কখনোই পারবে না।'

আমি হা হা হা করে হাসা ধরলাম। সাজিদ আমার দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলল, 'হাসছিস কেন এভাবে?'

'তোর কথা শুনে।'

'আমি হাসার কথা বলেছি?'

'অবশ্যই।'

সাজিদকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছে এই মুহূর্তে। আমি আবার বললাম, 'বিজ্ঞানের যে নির্দিষ্ট একটা গণ্ডি আছে, সীমাবদ্ধতা আছে, সেটা তুই জানিস না– এটাই আশ্চর্য লাগছে।'

'এটা কি তোর কথা?'

'না তো। আমার কথা না। বিজ্ঞানের কথা।'

'কোন বিজ্ঞান?' সাজিদের প্রশ্ন।

'কোয়ান্টাম মেকানিক্স।'

এবার সে একটু থামল। বলল, 'খুলে বল ব্যাটা।'

আমি একটু গলা খাঁকারি দিলাম। বললাম, 'জাফর ইকবাল স্যারের রেফারেন্স দিয়ে বলি?'

জাফর ইকবাল স্যারের ভীষণ ভক্ত আমরা দুজন। সাজিদ বলল, 'মানে?'

আমি বললাম, 'শোন, বিজ্ঞানের যে একটা নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা আছে, একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে যে বিজ্ঞান যায় না বা যেতে পারে না- সেটা আধুনিক বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেন। শ্রদ্ধেয় জাফর ইকবাল স্যারের বই 'কোয়ান্টাম মেকানিক্স পড়েছিস?'

'নাহ।'

আমার ব্যাগে স্যারের বইটা ছিল। আমি ব্যাগ খুলে বইটি বের করলাম। বইটির দশ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে কিছু লেখা সাজিদকে পড়ে শোনালাম। বইতে যা লেখা ছিল–

"কাজেই যারা বিজ্ঞান চর্চা করে তারা ধরেই নিয়েছে আমরা যখন বিজ্ঞান দিয়ে পুরো প্রকৃতিটাকে বুঝে ফেলব। তখন আমরা সবসময় সবকিছু সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারব। যদি কখনো দেখি কোনো একটা কিছু ব্যাখ্যা করতে পারছি না, তখন বুঝতে হবে এর পিছনের বিজ্ঞানটা তখনো জানা হয়নি। যখন জানা হবে তখন সেটা চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করতে পারব। এক কথায় বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা বা ভবিষ্যদ্‌বাণী সবসময়েই নিখুঁত এবং সুনিশ্চিত।"

কোয়ান্টাম মেকানিক্স বিজ্ঞানের এই ধারণাটাকে পুরোপুরি পালটে দিয়েছে। বিজ্ঞানীরা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করেছেন যে, প্রকৃতি আসলে কখনোই সবকিছু জানতে দেবে না। সে তার ভেতরের কিছু কিছু জিনিস মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে। মানুষ কখনোই সেটা জানতে পারবে না। সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যাপার হচ্ছে, এটা কিন্তু বিজ্ঞানের অক্ষমতা বা অসম্পূর্ণতা নয়। এটাই হচ্ছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানীরা একটা পর্যায়ে গিয়ে কখনোই আর জোর গলায় বলবেন না "হবে" তারা মাথা নেড়ে বলবেন, "হতে পারে"।

দেখ, বিজ্ঞান যে প্রকৃতির সব রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারবে না, তা বিজ্ঞান মহলে এখন স্বীকার্য। তাহলে যে বিজ্ঞান স্রষ্টার তৈরি প্রকৃতির সব রহস্য ভেদ করতে অক্ষম, তাকে বাটখারা বানিয়ে সেই প্রকৃতির স্রষ্টাকে জাস্টিফাই করাটা কি নিছক ছেলেমানুষি নয়?'

সাজিদ কিছু বলল না। আমি আবার বললাম, 'বিজ্ঞান যে সবকিছুর প্রমাণ দিতে পারে না, তার বিশাল একটা লিস্টও করে ফেলা যাবে চাইলে।'

সাজিদ রাগি রাগি গলায় বলল- 'ফাইজলামো করিস আমার সাথে?'

আমি হাসতে লাগলাম। বললাম- 'আচ্ছা শোন, বলছি। তোর প্রেমিকার নাম মিতু না?'

'এইখানে প্রেমিকার ব্যাপার আসছে কেন?'

'আরে বল না আগে।'

'হ্যাঁ।'

'কিছু মনে করিস না। কথার কথা বলছি। ধর, আমি মিতুকে ধর্ষণ করলাম। রক্তাক্ত অবস্থায় মিতু তার বেডে পড়ে আছে। আরও ধর, তুই কোনোভাবে ব্যাপারটা জেনে গেছিস।'

'হু।'

'এখন বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা কর দেখি, মিতুকে ধর্ষণ করায় কেন আমার শাস্তি হওয়া দরকার?'

সাজিদ বলল- 'ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চন। এটাকে বিজ্ঞান দিয়ে কীভাবে ব্যাখ্যা করব?'

'হা হা হা। আগেই বলেছি। এমন অনেক ব্যাপার আছে, যার উত্তর বিজ্ঞানে নেই।'

সাজিদ বলল, 'এটা কি ক্রাইম সাইন্সের অংশ না?'

'ক্রাইম সাইন্স যে কথা, পলিটিক্যাল সাইন্সও একই কথা। দুটোর সাথেই 'সাইন্স' শব্দ আছে। কিন্তু দিনশেষে দুটোর কোনোটাই আদতে সাইন্স না। হা হা হা।'

'কিন্তু এর সাথে স্রষ্টায় বিশ্বাসের সম্পর্ক কী?'

'সম্পর্ক আছে। স্রষ্টায় বিশ্বাসটাও এমন একটা বিষয়, যেটা আমরা মানে মানুষেরা, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণাদি দিয়ে প্রমাণ করতে পারব না। স্রষ্টা কোনো টেলিস্কোপে ধরা পড়েন না। উনাকে অণুবীক্ষণযন্ত্র দিয়েও খুঁজে বের করা যায় না। উনাকে জাস্ট বিশ্বাস করে নিতে হয়।'

সাজিদ এবার ২৬০ ডিগ্রি এঙ্গেলে বেঁকে বসল। সে বলল- 'ধুর! কী সব আবোলতাবোল বোঝালি। যা দেখি না, তাকে বিশ্বাস করে নেব?'

আমি বললাম- 'হ্যাঁ। পৃথিবীতে অবিশ্বাসী বলে কেউই নেই। সবাই বিশ্বাসী। সবাই এমন কিছু না কিছুতে ঠিক বিশ্বাস করে, যা তারা আদৌ দেখেনি বা দেখার কোনো সুযোগও নেই। কিন্তু এটা নিয়ে তারা প্রশ্ন তোলে না। তারা নির্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্তে তাতে বিশ্বাস করে যায়। তুইও ঠিক সেরকম।'

সাজিদ বলল- 'আমি? পাগল হয়েছিস? আমি না দেখে কোনো কিছুতেই বিশ্বাস করি না, ভবিষ্যতে কখনো করবও না।'

'তুই এখনও না দেখে অনেক কিছুই বিশ্বাস করিস এবং এটা নিয়ে তোর মধ্যে কোনোদিন কোনো প্রশ্নও জাগেনি, আজকে এই আলোচনা না করলে হয়তো জাগতও না।'

সে আমার দিকে কৌতূহলী তাকিয়ে রইল। বললাম- 'জানতে চাস?'

'হু।'

'আবার বলছি, কিছু মনে করিস না। যুক্তির খাতিরে বলছি।'

'ঠিক আছে, বল।'

'আচ্ছা, তোর বাবা-মা'র মিলনেই যে তোর জন্ম হয়েছে, সেটা তুই কখনো দেখেছিলি? বা, এই মুহূর্তে কোনো এভিডেন্স আছে তোর কাছে? হতে পারে তোর মা তোর বাবা ছাড়া অন্য কারও সাথে দৈহিক সম্পর্ক করেছে তোর জন্মের আগে। হতে পারে, তুই অই ব্যক্তিরই জৈব ক্রিয়ার ফল। তুই এটা দেখিসনি। কিন্তু কোনোদিনও কি তোর মা'কে এটা নিয়ে প্রশ্ন করেছিলি? নিশ্চয়ই করিসনি। সেই ছোটোবেলা থেকে যাকে বাবা হিসেবে দেখে আসছিস, এখওন তাকেই বাবা বলে ডাকছিস। যাকে ভাই হিসেবে জেনে আসছিস, তাকেই ভাই বলে ডাকিস। বোনকে বোন বলিস।

তুই না দেখেই এসবে বিশ্বাস করিস না? কোনোদিন জানতে চেয়েছিস এখন যাকে বাবা ডাকছিস, তুই আসলেই তার ঔরসজাত কি না? জানতে চাসনি। বিশ্বাস করে গেছিস। এখনও করছিস। ভবিষ্যতেও করবি। স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসটাও ঠিক এমনই রে দোস্ত। এটাকে প্রশ্ন করা যায় না। সন্দেহ করা যায় না। এটাকে হৃদয়ের গভীরে ধারণ করতে হয়। এটার নামই বিশ্বাস।'

সাজিদ উঠে বাইরে চলে গেল। ভাবলাম, সে আমার কথায় কষ্ট পেয়েছে হয়তো।

পরের দিন ভোরে আমি যখন ফজরের নামাজের জন্য অজু করতে যা, দেখলাম আমার পাশে সাজিদ এসে দাঁড়িয়েছে। আমি তার মুখের দিকে তাকালাম। সে আমার চাহনির প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছে। সে বলল- 'নামাজ পড়তে উঠেছি।'

তাকদির বনাম স্বাধীন ইচ্ছা : স্রষ্টা কি এখানে বিতর্কিত

সাজিদের ব্যাগে ইয়া মোটা একটা ডায়েরি থাকে সবসময়। ডায়েরিটা প্রাগৈতিহাসিক আমলের কোনো নিদর্শনের মতো। জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া। ছেঁড়া জায়গার কোনোটাতে সুতো দিয়ে সেলাই করা, কোনো জায়গায় আঁঠা দিয়ে প্রলেপ লাগানো, কোনো জায়গায় টেপ লাগানো। এই ডায়েরিতে সে তার জীবনের নানা উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো লিখে রাখে। বলে রাখি, সাজিদের ব্যক্তিগত ডায়েরিতে আমার এক্সেস অনুমতিপ্রাপ্ত। এই ডায়েরির মাঝামাঝি কোনো এক জায়গায় সাজিদ আমার সাথে প্রথম সাক্ষাতের ঘটনাটিও লিখে রেখেছে। তার সাথে আমার প্রথম দেখা হয় টিএসসিতে।

সে আমার সম্পর্কে লিখেছে–
'ভ্যাবলা টাইপের এক ছেলের সাথে সাক্ষাৎ হলো আজ। দেখলেই মনে হবে জগতের কঠিন বিষয়ের কোনো কিছুই সে বোঝে না। কথা বলার পরে বুঝলাম, এই ছেলে অত্যন্ত বুদ্ধিমান, কিন্তু দেখতে হাবাগোবা। ছেলেটার নাম– আরিফ। ৫ই মার্চ, ২০০৯।'

এই ডায়েরিতে নানান বিখ্যাত ব্যক্তিদের কথাও লেখা আছে। একবার কানাডার টরেন্টোতে সাজিদ তার বাবার সাথে একটি অফিসিয়াল টুরে গিয়েছিল। সেখানে অনেক সেলিব্রেটির সাথে বিল গেটসও আমন্ত্রিত ছিলেন। বিল গেটস সেখানে দশ মিনিটের জন্য বক্তৃতা রেখেছিলেন। সেই ঘটনাটিও ডায়েরিতে লেখা আছে।

সিলেট শাহজালাল ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজির কমপিউটার সাইন্স ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর ড. জাফর ইকবালের সাথে সাজিদের একবার বই মেলায় দেখা হয়ে যায়। সেবারের বইমেলায় জাফর স্যারের বই *একটুখানি বিজ্ঞান*-এর দ্বিতীয় কিস্তি আরও *একটুখানি বিজ্ঞান* প্রকাশিত হয়। বই কিনে বের হওয়ার পথে জাফর স্যারের সাথে দেখা হয়ে যায় সাজিদের। অটোগ্রাফ নিয়ে স্যারের কাছে হেসে জানতে চাইল স্যার, *একটুখানি বিজ্ঞান* পাইলাম। এরপর পাইলাম আরও *একটুখানি বিজ্ঞান*। এটার পরে, 'আরও আরও একটুখানি বিজ্ঞান' কবে পাচ্ছি?' সেদিন নাকি জাফর স্যার মিষ্টি হেসে বলেছিলেন– 'পাবে, পাবে।'

নিজের সাথে ঘটে যাওয়া এরকম অনেক ঘটনাই ঠাঁই পেয়েছে সাজিদের ডায়েরিটাতে। ডায়েরির আদ্যোপান্ত আমার পড়া ছিল। কিন্তু সেমিস্টার ফাইনাল সামনে চলে আসায় গত বেশ কিছুদিন তার ডায়েরিটা আর পড়া হয়নি।

সেদিন থার্ড সেমিস্টারের শেষ পরীক্ষাটি দিয়ে রুমে এলাম। এসে দেখি সাজিদ ঘরে নেই। টেবিলের ওপরে তার ডায়েরিটা খোলা অবস্থায় পড়ে আছে।

ঘর্মাক্ত শরীর। কাঠফাটা রোদের মধ্যে ক্যাম্পাস থেকে হেঁটে বাসায় ফিরেছি। এই মুহূর্তে বসে ডায়েরিটা উলটাব, সে শক্তি বা ইচ্ছে কোনোটাই নেই। কিন্তু ডায়েরিটা বন্ধ করতে গিয়ে একটি শিরোনামে আমার চোখ আটকে গেল। আমি সাজিদের টেবিলেই বসে পড়ি। লেখাটির শিরোনাম ছিল– 'ভাগ্য বনাম স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি, স্রষ্টা কি এখানে বিতর্কিত?'

বেশ লোভনীয় শিরোনাম। শারীরিক ক্লান্তি ভুলেই আমি ঘটনাটির প্রথম থেকে পড়া শুরু করলাম। ঘটনাটি সাজিদের ডায়েরিতে যেভাবে লেখা, ঠিক সেভাবেই তুলে ধরছি–

কয়েক দিন আগে ক্লাসের থার্ড পিরিয়ডে মফিজুর রহমান স্যার এসে আমাকে দাঁড় করালেন। বললেন– 'তুমি কি ভাগ্য, আইমিন তাকদিরে বিশ্বাস করো?' আমি আচমকা অবাক হলাম। আসলে এই আলাপগুলো হলো ধর্মীয় আলাপ। মাইক্রোবায়োলজির একজন শিক্ষক যখন ক্লাসে এসে এসব জিজ্ঞেস করেন, তখন খানিকটা বিব্রতবোধ করাই স্বাভাবিক। স্যার আমার উত্তরের আশায় মুখের দিকে চেয়ে আছেন। আমি বললাম– 'জি, স্যার। অ্যাজ অ্যা মুসলিম, আমি তাকদিরে বিশ্বাস করি। এটি আমার ঈমানের মূল সাতটি বিষয়ের মধ্যে একটি।'

স্যার বললেন– 'তুমি কি বিশ্বাস করো যে, মানুষ জীবনে যা যা করবে সবকিছুই জন্মের অনেক বছর আগে তার তাকদিরে লিখে দেওয়া হয়েছে?'

'জি স্যার', আমি উত্তর দিলাম।

'বলা হয়, স্রষ্টার ইচ্ছা ছাড়া গাছের একটি ক্ষুদ্র পাতাও নড়ে না, তাই না?'

'জ্বি, স্যার।'

'ধরো, আজ সকালে আমি একজন লোককে খুন করলাম। তাহলে কি আমার তাকদিরে পূর্ব নির্ধারিত ছিল না?'

'জি, ছিল।'

'আমার তাকদির যখন লেখা হচ্ছিল, তখন কি আমি জীবিত ছিলাম?'

'না স্যার, জীবিত ছিলেন না।'

'আমার তাকদির কে লিখেছে? কার নির্দেশে লেখা হয়েছে?'

'স্রষ্টার।'

'তাহলে, সোজা এবং সরল লজিক এটাই বলে, আজ সকালে যে খুনটি আমি করেছি, সেটি মূলত আমি করিনি। আমি এখানে একটি রোবট মাত্র।

আমার ভেতরে একটি প্রোগ্রাম সেট করে দিয়েছেন স্রষ্টা। সেই প্রোগ্রামে লেখা ছিল যে, আজ সকালে আমি একজন লোককে খুন করব। সুতরাং আমি ঠিক তাই-ই করেছি, যা আমার জন্য স্রষ্টা পূর্বে ঠিক করে রেখেছেন। এতে আমার কোনো হাত নেই। ডু ইউ অ্যাগ্রি, সাজিদ?'

'কিছুটা স্যার।' আমি উত্তর দিলাম।

মফিজুর স্যার এবার হাসলেন। হেসে বললেন– 'আমি জানতাম তুমি কিছুটাই একমত হবে, পুরোটা নয়। এখন তুমি আমাকে নিশ্চয়ই যুক্তি দেখিয়ে বলবে স্যার, স্রষ্টা আমাদের একটি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন। আমরা এটা দিয়ে ভালো– মন্দ বিচার করে চলি, রাইট?'

'জি, স্যার।'

'কিন্তু সাজিদ, এটা খুবই লেইম লজিক। ডু ইউ নো? ধরো, আমি তোমার হাতে বাজারের একটি তালিকা দিলাম। তালিকায় যা যা কিনতে হবে, তার সবকিছু লেখা আছে। এখন তুমি বাজার করে ফিরলে। তুমি ঠিক তা-ই তা-ই কিনলে যা আমি তালিকায় লিখে দিয়েছি এবং তুমি এটা করতে বাধ্য।'

এতটুকু বলে স্যার আমার কাছে জানতে চাইলেন– 'বুঝতে পারছ?'

আমি বললাম– 'জি স্যার।'

'ভেরি গুড! ধরো, তুমি বাজার করে আসার পর, একজন জিজ্ঞেস করল, "সাজিদ কী কী বাজার করেছ?" তখন আমি উত্তর দিলাম, "ওর যা যা খেতে মন চেয়েছে, তা-ই কিনেছে।" বলো তো, আমি সত্য বলেছি কি না?'

আমি বললাম– 'নাহ, আপনি মিথ্যা বলেছেন।'

স্যার চিৎকার করে বলে উঠলেন– 'এক্সাক্টলি, ইউ হ্যাভ গট দ্য পয়েন্ট মাই ডিয়ার। আমি মিথ্যা বলেছি। আমি তালিকাতেই বলে দিয়েছি তোমাকে কী কী কিনতে হবে। তুমি ঠিক তা-ই কিনেছ, যা আমি কিনতে বলেছি। যা কিনেছ সব আমার পছন্দের জিনিস। এখন আমি যদি বলি- "ওর যা যা খেতে মন চেয়েছে, সে তাই তাই কিনেছে।" তাহলে এটা একটা ডাহা মিথ্যা কথা হবে, তাই না?'

'জি, স্যার।'

'ঠিক স্রষ্টাও এভাবে মিথ্যা বলেছেন। দুই নম্বরি করেছেন। তিনি অনেক আগে আমাদের তাকদির লিখে তা আমাদের গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছেন। এখন আমরা সেটাই করি, যা স্রষ্টা সেখানে লিখে রেখেছেন। অ্যান্ড অ্যাট দ্যা এন্ড অফ দ্য ডে, এই কাজের জন্য কেউ জান্নাতে যাচ্ছে, কেউ জাহান্নামে। কিন্তু কেন? এখানে মানুষের তো কোনো হাত নেই। ম্যানুয়ালটা স্রষ্টার তৈরি। আমরা তো জাস্ট পারফর্মার। স্ক্রিপ্ট রাইটার তো স্রষ্টা। স্রষ্টা এর জন্য আমাদের কাউকে জান্নাত, কাউকে জাহান্নাম দিতে পারেন না। যুক্তি তাই বলে, ঠিক?'

আমি চুপ করে রইলাম। পুরো ক্লাসে পিনপতন নীরবতা বিরাজ করছে তখন।

স্যার বললেন– 'হ্যাভ ইউ অ্যানি প্রোপার লজিক অন দ্যাট ট্রিপিক্যাল কোয়েশ্চন, ডিয়ার?'

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলাম।

স্যার মুচকি হাসলেন। সম্ভবত ভাবছেন, উনি আমাকে এবার সত্যি সত্যিই কুপোকাত করে দিলেন। বিজয়ীর হাসি।

আমাকে যারা চেনে তারা সবাই জানে, আমি কখনো কারও প্রশ্নের উত্তর দিতে সময় নিই না। আজকে যেহেতু তার ব্যতিক্রম ঘটল, বন্ধুরা আমার দিকে ড্যাব ড্যাব চোখ করে তাকাল। তাদের চাহনি দেখে মনে হচ্ছিল, এই সাজিদকে তারা চেনেই না। কোনোদিন দেখেনি।

ক্লাসে আমার বিরুদ্ধ মতের যারা আছে, তাদের চেহারা তখন মুহূর্তেই উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করল। তারা হয়তো মনে মনে ভাবতে লাগল– মোল্লাজির দৌড় ওই মসজিদ পর্যন্তই।'

আমি মুখ তুলে স্যারের দিকে তাকালাম। মুচকি হাসিটা স্যারের মুখে তখনও বিরাজমান।

আমি বললাম– 'স্যার, এই ক্লাসে কার সম্পর্কে আপনার কী অভিমত?'

স্যার ভ্যাবাচ্যাকা খেলেন। স্যার জিজ্ঞেস করেছেন কী আর আমি বলছি কী।

স্যার বললেন– 'বুঝলাম না।'

'মানে, আমাদের ক্লাসের কার মেধা কীরকম, সে বিষয়ে আপনার ধারণা কেমন?'

'ভালো ধারণা। ছাত্রদের সম্পর্কে একজন শিক্ষকেরই তো সবচেয়ে ভালো জ্ঞান থাকে।'

আমি বললাম– 'স্যার, আপনি বলুন তো, এই ক্লাসের কারা কারা ফার্স্ট ক্লাস পাবে আর কারা কারা সেকেন্ড ক্লাস পাবে?'

স্যার কিছুটা বিস্মিত হলেন। বললেন– 'আমি তোমাকে অন্য বিষয়ে প্রশ্ন করেছি। তুমি আউট অফ কনটেক্সটে গিয়ে পালটা প্রশ্ন করছ, সাজিদ।'

'না স্যার, আমি কনটেক্সটেই আছি। আপনি উত্তর দিন।'

স্যার বললেন– 'এই ক্লাস থেকে রায়হান, মমতাজ, ফারহানা, সজীব, ওয়ারেস, ইফতি, সুমন, জাবেদ ও তুমি ফার্স্ট ক্লাস পাবে। আর বাকিরা সেকেন্ড ক্লাস পাবে।'

স্যার যাদের নাম বলেছেন, তারা সবাই ক্লাসের ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট। সুতরাং স্যারের অনুমান খুব একটা ভুল না।

আমি বললাম– 'স্যার, আপনি এটা লিখে দিতে পারেন?'

'হোয়াই নট,' স্যার বললেন।

এই বলে তিনি খচখচ করে একটা কাগজের একপাশে যারা ফার্স্ট ক্লাস পাবে তাদের নাম, অন্যপাশে যারা সেকেন্ড ক্লাস পাবে, তাদের নাম লিখে আমার হাতে দিলেন।

আমি বললাম– 'স্যার, ধরে নিলাম যে, আপনার ভবিষ্যদ্‌বাণী সম্পূর্ণ সত্য হয়েছে। মানে, আপনি ফার্স্ট ক্লাস পাবেন বলে যাদের নাম লিখেছেন, তারা সবাই ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে, আর যারা সেকেন্ড ক্লাস পাবে লিখেছেন, তাদের সবাই সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছে।'

'হুম, তো?'

'এখন স্যার বলুন তো প্লিজ, যারা ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে, কেবল আপনি এই কাগজে তাদের নাম লিখেছেন বলেই কি তারা ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে?'

'না তো।'

'যারা সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছে, কেবল আপনি এই কাগজে লিখেছেন বলেই কি তারা সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছে?'

স্যার বললেন– 'একদম না।'

'তাহলে মূল ব্যাপারটি কী স্যার?'

স্যার বললেন– 'মূল ব্যাপার হলো, আমি তোমাদের শিক্ষক। আমি খুব ভালো করেই জানি, পড়াশোনায় তোমাদের কে কেমন। আমি খুব ভালো করেই জানি, কার মেধা কেমন। সুতরাং আমি চোখ বন্ধ করেই বলে দিতে পারি কে কেমন রেজাল্ট করবে।'

আমি হাসলাম। বললাম– 'স্যার, যারা সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছে, তারা যদি আপনাকে দোষ দেয়? যদি বলে, আপনি 'সেকেন্ড ক্লাস' ক্যাটাগরিতে তাদের নাম লিখেছেন বলেই তারা সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছে?'

স্যার কপালের ভাঁজ লম্বা করে বললেন– 'ইট উড বি টোটালি রং! আমি কেন এর জন্য দায়ী হব? এটা তো সম্পূর্ণ তাদের দায়। আমি শুধু তাদের মেধা, যোগ্যতা সম্পর্কে ধারণা রাখি বলেই অগ্রিম বলে দিতে পেরেছি যে, কে কেমন রেজাল্ট করবে।'

আমি এবার জোরে জোরে হাসতে লাগলাম। পুরো ক্লাস আমার দিকে হা করে তাকিয়ে আছে।

আমি থামলাম। বললাম– 'স্যার, তাকদির তথা ভাগ্যটাও ঠিক এরকম। আপনি যেমন আমাদের মেধা, যোগ্যতা, ক্ষমতা সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখেন, স্রষ্টাও তেমনি তার সৃষ্টি সম্পর্কে জানেন। আপনার ধারণা মাঝে মাঝে ভুল হতে পারে, কিন্তু স্রষ্টার জানাতে কোনো ভুল নেই। স্রষ্টা হলেন আলিমুল গায়েব। তিনি ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সব জানেন। সব।

‘আপনি আমাদের সম্পর্কে পূর্বানুমান করে লিখে দিয়েছেন যে, আমাদের মধ্যে কারা ফার্স্ট ক্লাস পাবে, আর কারা সেকেন্ড ক্লাস পাবে। এর মানে কিন্তু এই নয় যে, আপনি বলেছেন বলে আমরা কেউ ফার্স্ট ক্লাস পাচ্ছি, কেউ সেকেন্ড ক্লাস পাচ্ছি। আমরা যে যা রেজাল্ট করছি, সেটা তার মেধা, যোগ্যতা ও পরিশ্রমের আল্টিমেট ফল।

‘তো স্রষ্টা যেহেতু তাঁর সৃষ্টির ব্যাপারে সব জানেন, কাজেই তিনি সে অনুযায়ী আমাদের তাকদির লিখে রেখেছেন। তাতে লেখা আছে দুনিয়ায় আমরা কে কী করব। এর মানেও কিন্তু এই নয় যে, তিনি লিখে দিয়েছেন বলেই আমরা কাজগুলো করছি। বরং এর মানে হলো তিনি জানেন যে, আমরা দুনিয়ায় এই এই কাজগুলো করব। তাই তিনি তা অগ্রিম লিখে রেখেছেন তাকদির হিসেবে।

‘আমাদের মধ্যে কেউ ফার্স্ট ক্লাস আর কেউ সেকেন্ড ক্লাস পাওয়ার জন্য যেমন কোনোভাবেই আপনি দায়ী নন; ঠিক সেভাবে মানুষের মধ্যে কেউ ভালো কাজ করে জান্নাতে, আর কেউ খারাপ কাজ করে জাহান্নামে যাওয়ার জন্যও স্রষ্টা দায়ী নন। স্রষ্টা জানেন যে, আপনি আজ সকালে একজনকে খুন করবেন। তাই তিনি সেটা আগেই আপনার তাকদিরে লিখে রেখেছেন। এটার মানে এই নয় যে স্রষ্টা লিখে রেখেছেন বলেই আপনি খুনটি করেছেন। এর মানে হলো– স্রষ্টা জানেন যে, আপনি আজ খুনটি করবেন। তাই সেটা অগ্রিম লিখে রেখেছেন আপনার তাকদির হিসেবে। স্যার, ব্যাপারটা কি এখন পরিষ্কার?’

স্যারের চেহারা কিছুটা ফ্যাকাসে মনে হলো। তিনি বললেন– ‘হুম।’

এরপর স্যার কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। তারপর বললেন– ‘আমি শুনেছিলাম তুমি কদিন আগেও নাস্তিক ছিলে। তুমি আবার আস্তিক হলে কবে?’

আমি হা হা হা করে হাসলাম। বললাম– ‘স্যার, এই প্রশ্নটা কিন্তু আউট অফ কনটেক্সট।’

এটা শুনে পুরো ক্লাস হাসিতে ফেটে পড়ল। স্যার এবার ক্লাসের একাডেমিক লেকচার শুরু করলেন।

ক্লাসের একদম শেষদিকে স্যার আবার আমাকে দাঁড় করালেন। বললেন– ‘বুঝলাম, স্রষ্টা আগে থেকে জানেন বলেই লিখে রেখেছেন। তিনি যেহেতু আগে থেকেই জানেন, কে ভালো কাজ করবে আর কে খারাপ কাজ করবে, তাহলে পরীক্ষা নেওয়ার কী দরকার? যারা জান্নাতে যাওয়ার তাদের জান্নাতে, আর যারা জাহান্নামে যাওয়ার তাদের জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেই তো হতো, তাই না?’

আমি আবার হাসলাম। আমার হাতে স্যারের লিখে দেওয়া কাগজটি তখনও ধরা ছিল। আমি সেটা স্যারকে দেখিয়ে বললাম– ‘স্যার, এই কাগজে কারা কারা ফার্স্ট ক্লাস পাবে, আর কারা কারা সেকেন্ড ক্লাস পাবে, তাদের নাম লেখা আছে। তাহলে এই কাগজটির ভিত্তিতেই রেজাল্ট দিয়ে দিন। বাড়তি করে পরীক্ষা নিচ্ছেন কেন?’

স্যার বললেন– 'পরীক্ষা না নিলে কেউ হয়তো এই বলে অভিযোগ করতে পারে যে, স্যার আমাকে ইচ্ছা করেই সেকেন্ড ক্লাস দিয়েছে। পরীক্ষা দিলে আমি হয়তো ঠিকই ফার্স্ট ক্লাস পেতাম।'

আমি বললাম– 'একদম তাই, স্যার। স্রষ্টাও এজন্য পরীক্ষা নিচ্ছেন, যাতে কেউ বলতে না পারে; দুনিয়ায় পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকলে আমি অবশ্যই আজকে জান্নাতে থাকতাম। স্রষ্টা ইচ্ছা করেই আমাকে জাহান্নামে পাঠিয়েছেন।'

ক্লাসের সবাই হাততালি দিতে শুরু করল। স্যার বললেন– 'সাজিদ, আই হ্যাভ অ্যা লাস্ট কোয়েশ্চন।'

'ডেফিনেটলি, স্যার।', আমি বললাম।

'আচ্ছা, যে মানুষ পুরো জীবনে খারাপ কাজ বেশি করে, সে অন্তত কিছু না কিছু ভালো কাজ তো করে, তাই না?'

'জি স্যার।'

'তাহলে, এই ভালো কাজগুলোর জন্য হলেও তো তার জান্নাতে যাওয়া দরকার, তাই না?'

আমি বললাম– 'স্যার, পানি কীভাবে তৈরি হয়?'

স্যার আবার অবাক হলেন। হয়তো বলতে যাচ্ছিলেন যে, এই প্রশ্নটাও আউট অফ কনটেক্সট। কিন্তু কী ভেবে যেন চুপসে গেলেন। বললেন– 'দুই ভাগ হাইড্রোজেন আর এক ভাগ অক্সিজেনের সংমিশ্রণে।'

আমি বললাম– 'আপনি এক ভাগ হাইড্রোজেন আর এক ভাগ অক্সিজেন দিয়ে পানি তৈরি করতে পারবেন?'

'কখনোই না।'

'ঠিক সেভাবে, এক ভাগ ভালো কাজ আর এক ভাগ মন্দ কাজে জান্নাত পাওয়া যায় না। জান্নাত পেতে হলে হয় তিন ভাগই ভালো কাজ হতে হবে, নতুবা দুই ভাগ ভালো কাজ, এক ভাগ মন্দ কাজ হতে হবে। অর্থাৎ, ভালো কাজের পাল্লা ভারী হওয়া আবশ্যক।'

সেদিন স্যার আর কোনো প্রশ্ন আমাকে করেননি।

ডায়েরিতে সাজিদের লেখা এক নিঃশ্বাসে পুরোটা পড়ে ফেললাম। কোথাও একটুও থামিনি। পড়া শেষে যেই মাত্র ডায়েরিটা বন্ধ করতে যাব, অমনি দেখলাম, পেছন থেকে সাজিদ এসে আমার কান মলে ধরেছে। বলল– 'তুই তো সাংঘাতিক লেভেলের চোর। চুরি করে আমার ডায়েরি পড়ছিস।'

আমি হেসে বললাম– 'হা হা হা। ভুলে গেছিস যে, এই ডায়েরি পড়ার এক্সেস তুই নিজেই আমাকে দিয়েছিলি!'

সাজিদ জিহ্বায় কামড় দিয়ে বলল– 'সেটা আমার উপস্থিতিতে কিন্তু!'

আমি প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দিতে বললাম, 'স্যারকে তো সেদিন ভালো জব্দ করেছিস রে দোস্ত!'

কথাটা সে কানে নিল বলে মনে হলো না। নিজের সম্পর্কে কোনো কমপ্লিমেন্টই সে আমলে নেয় না। গামছায় মুখ মুছতে মুছতে খাটের ওপর শুয়ে পড়ল।

আমি তার কাঁধে হাত রাখলাম। বললাম– 'সাজিদ...'

'হু'

'একটা কথা বলব?'

'বল।'

'জানিস, একসময় যুবকেরা হিমু হতে চাইত। হলুদ পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে, মরুভূমিতে গর্ত খুঁড়ে জ্যোৎস্না দেখার স্বপ্ন দেখত। দেখিস, এমন একদিন আসবে, যেদিন যুবকেরা সাজিদ হতে চাইবে। ঠিক তোর মতো।'

কথাগুলো বলেই আমি সাজিদের দিকে তাকালাম। দেখলাম, ততক্ষণে সে ঘুমিয়ে পড়েছে। অঘোর ঘুম...। এক প্রশান্ত মুখের দিক থেকে আমি চোখ ফেরাতে পারছি না।

স্রষ্টা কেন মন্দ কাজের দায় নেন না

মফিজুর রহমান স্যারের ক্লাস। স্যার হালকা-পাতলা গড়নের। বাতাস এলেই যেন ঢলে পড়বেন। খুবই খারাপ অবস্থা শরীরের। ভদ্রলোকের চেহারার চেয়ে চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকম বড়। দেখলেই মনে হয় যেন বড়ো বড়ো সাইজের দুটো জলপাই কেউ খোদাই করে বসিয়ে দিয়েছে। তবে ভদ্রলোক খুবই ভালো মানুষ। ওনার সমস্যা একটাই– ক্লাসে উনি যতটা না বায়োলজি পড়ান, তার চেয়ে বেশি দর্শন চর্চা করেন। ধর্ম কোথা থেকে এলো, ঠিক কবে থেকে মানুষ ধার্মিক হওয়া শুরু করল, ধর্ম আদতে কী, আর কী নয় এসবই তার আগ্রহ ও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।

আজকে ওনার চতুর্থ ক্লাস। পড়াবেন Analytical Techniques & Bio-Informatics। চতুর্থ সেমিস্টারে এটা পড়ানো হয়।

স্যার এসে প্রথমে বললেন-'Good Morning, Guys.'

সবাই সমস্বরে বলল– 'Good Morning, Sir.'

এরপর স্যার জিজ্ঞেস করলেন– 'সবাই কেমন আছ?'

স্যারের আরও একটি ভালো দিক হলো– উনি ক্লাসে এলে এভাবেই সবার কুশলাদি জিজ্ঞেস করেন। সাধারণত হায়ার লেভেলে যেটা সব শিক্ষক করেন না। তারা রোবটের মতো ক্লাসে আসেন, যন্ত্রের মতো করে লেকচার পড়িয়ে বেরিয়ে যান। সেদিক থেকে মফিজুর রহমান নামের এই ভদ্রলোক অনেকটা অন্যরকম।

আবারও সবাই সমস্বরে উত্তর দিলো। কিন্তু গোলমাল বাঁধল এক জায়গায়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে কয়েকজন উত্তর দিয়েছে এভাবে– 'আলহামদুলিল্লাহ, ভালো।'

স্যার কপালের ভাঁজ একটু দীর্ঘ করে বললেন– 'আলহামদুলিল্লাহ, ভালো বলেছ কে কে?'

অদ্ভুত প্রশ্ন। সবাই থতমত খেল।

একটু আগেই বলেছি, স্যার একটু অন্যরকম। প্রাইমারি লেভেলের টিচারদের মতো ক্লাসে এসে বিকট চিৎকার করে 'Good Morning' বলেন, সবাই কেমন আছে জানতে চান। এখন 'আলহামদুলিল্লাহ' বলার জন্য কি প্রাইমারি লেভেলের শিক্ষকদের মতো বেত দিয়ে পেটাবেন নাকি?

সাজিদের তখন তার প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক বাবুল চন্দ্র দাসের কথা মনে পড়ে গেল। এই লোকটা ক্লাসে কেউ দুটোর বেশি হাঁচি দিলেই বেত দিয়ে আচ্ছা মতো পেটাতেন। ওনার কথা হলো– 'হাঁচির সর্বোচ্চ পরিমাণ হবে দুটো। দুটোর বেশি হাঁচি দেওয়া মানে ইচ্ছে করেই বেয়াদবি করা।'

যা হোক, বাবুল চন্দ্রের পাঠ তো কবেই চুকেছে, এবার মফিজ স্যারের হাতেই না গণপিটুনি খাওয়া লাগে। ক্লাসের সর্বমোট সাতজন দাঁড়াল। এরা সবাই 'আলহামদুলিল্লাহ ভালো' বলেছে। এরা হচ্ছে– রাকিব, আদনান, জুনায়েদ, সাকিব, মরিয়ম, রিতা ও সাজিদ। স্যার সবার চেহারাটা একটু ভালো মতো পরখ করে নিলেন। এরপর ফিক করে হেসে দিয়ে বললেন– 'বসো।'

সবাই বসল। আজকে আর মনে হয় একাডেমিক পড়াশোনা হবে না। দর্শনের তাত্ত্বিক আলাপ হবে। ঠিক তাই হলো। মফিজুর রহমান স্যার আদনানকে দাঁড় করালেন। বললেন– 'তুমিও বলেছিলে সেটা, না?'

'জি স্যার।' আদনান উত্তর দিল।

স্যার বললেন– 'আলহামদুলিল্লাহর অর্থ কি জানো?'

আদনান মনে হয় একটু ভয় পাচ্ছে। সে ঢোঁক গিলতে গিলতে বলল– 'জি স্যার, আলহামদুলিল্লাহ্ অর্থ হলো : সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহ তায়ালার।'

স্যারও বললেন– 'সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহ তায়ালার।'

স্যার এই বাক্যটি দুবার উচ্চারণ করলেন। এরপর আদনানের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'বসো।'

আদনান বসল। এবার স্যার রিতাকে দাঁড় করালেন। স্যার রিতার কাছে জিজ্ঞেস করলেন– 'আচ্ছা, পৃথিবীতে চুরি-ডাকাতি আছে?'

রিতা বলল– 'আছে।'

'খুন-খারাবি, রাহাজানি, ধর্ষণ?'

'জি,আছে।'

'কথা দিয়ে কথা না রাখা, মানুষকে ঠকানো, লোভ-লালসা এসব?'

'জি, আছে।'

'এগুলো কি প্রশংসাযোগ্য?'

'না।'

‘তাহলে মানুষ একটি ভালো কাজ করার পর তার সব প্রশংসা যদি আল্লাহর হয়, মানুষ যখন চুরি-ডাকাতি করে, লোক ঠকায়, খুন-খারাবি করে, ধর্ষণ করে, তখন সব মন্দের ক্রেডিট আল্লাহকে দেওয়া হয় না কেন ? উনি প্রশংসার ভাগ পাবেন, কিন্তু দুর্নামের ভাগ নেবেন না– তা কেমন একপেশে হয়ে গেল না?’

রিতা মাথা নিচু করে চুপ করে আছে। স্যার বললেন– ‘এখানেই ধর্মের ভেল্কিবাজি। ঈশ্বর শুধু ভালোটা বোঝেন, কিন্তু মন্দ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। আদতে, ঈশ্বর বলে কেউ নেই। যদি থাকত, তাহলে তিনি এরকম একচোখা হতেন না। বান্দার ভালো কাজের ক্রেডিটটা নিজে নিয়ে নেবেন, কিন্তু মন্দ কাজের বেলায় বলবেন– উহু, ওইটা থেকে আমি পবিত্র। ওইটা তোমার ভাগ।’

স্যারের কথা শুনে ক্লাসে যে কজন নাস্তিক আছে, তারা হাততালি দেওয়া শুরু করল। সাজিদের পাশে যে নাস্তিকটা বসেছে, সে তো বলেই বসল– ‘মফিজ স্যার হলেন আমাদের বাংলার প্লেটো।’

স্যার ধর্ম আর স্রষ্টার অসাড়তা নিয়ে বলেই যাচ্ছেন। এবার সাজিদ দাঁড়াল। স্যারের কথার মাঝে সে বলল– ‘স্যার, সৃষ্টিকর্তা একচোখা নন। তিনি মানুষের ভালো কাজের ক্রেডিট নেন না। তিনি ততটুকুই নেন, যতটুকু তিনি পাবেন। ঈশ্বর আছেন।’

স্যার সাজিদের দিকে একটু ভালোভাবে তাকালেন। বললেন– ‘শিওর’?

‘জি।’

‘তাহলে মানুষের মন্দ কাজের জন্য কে দায়ী?’

‘মানুষই দায়ী।’ সাজিদ বলল।

‘ভালো কাজের জন্য?’

‘তা-ও মানুষ।’

স্যার এবার চিৎকার করে বললেন– ‘এক্সাক্টলি, এটাই বলতে চাচ্ছি। ভালো-মন্দ এসব মানুষেরই কাজ। সুতরাং এর সব ক্রেডিটই মানুষের। এখানে স্রষ্টার কোনো হাত নেই। তিনি এখান থেকে না প্রশংসা পেতে পারেন, না তিরস্কার। সোজা কথায়, স্রষ্টা বলতে কেউই নেই।’

ক্লাসে পিনপতন নীরবতা। সাজিদ বলল– ‘মানুষের ভালো কাজের জন্য স্রষ্টা অবশ্যই প্রশংসা পাবেন। কারণ, মানুষকে স্রষ্টা ভালো কাজ করার জন্য দুটো হাত দিয়েছেন, ভালো জিনিস দেখার জন্য দুটো চোখ দিয়েছেন, চিন্তা করার জন্য মস্তিষ্ক দিয়েছেন, দুটো পা দিয়েছেন। এসব কিছুই স্রষ্টার দান। তাই ভালো কাজের জন্য তিনি অবশ্যই প্রশংসা পাবেন।’

স্যার বললেন– ‘এগুলো দিয়ে তো মানুষ খারাপ কাজও করে, তখন?’

‘এর দায় স্রষ্টার নয়।’

‘হা হা হা। তুমি খুব মজার মানুষ দেখছি। একইসাথে কিছুটা বোকাও বটে! হা হা হা।’

সাজিদ বলল– ‘স্যার, স্রষ্টা মানুষকে একটি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন। এটা দিয়ে সে নিজেই নিজের কাজ ঠিক করে নেয়। সে কি ভালো করবে, নাকি মন্দ করবে।’

স্যার তিরস্কারের সুরে বললেন– ‘ধর্মীয় কিতাবাদির কথা বাদ দাও। কাম টু দ্য পয়েন্ট অ্যান্ড বি লজিক্যাল।’

সাজিদ বলল– ‘স্যার, আমি কি উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে পারি বিষয়টা?’

‘অবশ্যই।’ স্যার বললেন।

সাজিদ বলতে শুরু করল–

‘ধরুন, খুব গভীর সাগরে একটি জাহাজ ডুবে গেল। ধরুন, সেটা বার্মুডা ট্রায়াঙ্গাল। কোনো ডুবুরিই সেখানে ডুব দিয়ে জাহাজের মানুষগুলোকে উদ্ধার করতে পারছে না। বার্মুডা ট্রায়াঙ্গালে তো নয়ই। এই মুহূর্তে ধরুন সেখানে আপনার আবির্ভাব ঘটল। আপনি সবাইকে বললেন– “আমি এমন একটি যন্ত্র বানিয়ে দিতে পারি, যেটা গায়ে লাগিয়ে যেকোনো মানুষ খুব সহজেই ডুবে যাওয়া জাহাজের মানুষগুলোকে উদ্ধার করতে পারবে। ডুবুরির কোনো রকম ক্ষতি হবে না।”’

স্যার বললেন– ‘হুম, তো?’

‘ধরুন, আপনি যন্ত্রটি তৎক্ষণাৎ বানালেন এবং একজন ডুবুরি সেই যন্ত্র গায়ে লাগিয়ে ডুবে যাওয়া মানুষগুলোকে উদ্ধার করতে সাগরে নেমে পড়ল।’

ক্লাসে তখন একদম পিনপতন নীরবতা। সবাই মুগ্ধ শ্রোতা। কারও চোখের পলকই যেন পড়ছে না। সাজিদ বলে যেতে লাগল– ‘ধরুন, ডুবুরিটা ডুব দিয়ে ডুবে যাওয়া জাহাজে চলে গেল। সেখানে গিয়ে সে দেখল, মানুষগুলো হাঁসফাসঁ করছে। সে একে একে সবাইকে একটি করে অক্সিজেন সিলিন্ডার দিয়ে দিলো। তাদেরকে একজন একজন করে উদ্ধার করতে লাগল।’

স্যার বললেন– ‘হুম।’

সাজিদ বলছে– ‘ধরুন, সব যাত্রীকে উদ্ধার করা শেষ। বাকি আছে মাত্র একজন। ডুবুরি যখন শেষ লোকটাকে উদ্ধার করতে গেল, তখন দেখল, এই লোকটাকে সে আগে থেকেই চেনে।’

এতটুকু বলে সাজিদ স্যারের কাছে প্রশ্ন করল– ‘স্যার, এরকম কি হতে পারে না?’

স্যার বললেন– ‘অবশ্যই হতে পারে। লোকটা ডুবুরির আত্মীয় বা পরিচিত হয়ে যেতেই পারে। অস্বাভাবিক কিছু নয়।’

সাজিদ বলল– 'জি। ডুবুরি লোকটাকে চিনতে পারল। সে দেখল, এটা হচ্ছে তার চরম শত্রু। এই লোকের সাথে তার দীর্ঘদিনের বিরোধ চলছে। এরকম হতে পারে না, স্যার?'

'হ্যাঁ, হতে পারে।'

সাজিদ বলল– 'ধরুন, ডুবুরির মধ্যে ব্যক্তিগত হিংসাবোধ জেগে উঠল। সে শত্রুতাবশত ঠিক করল যে, এই লোকটাকে সে বাঁচাবে না। কারণ লোকটা তার দীর্ঘদিনের শত্রু। সে এই চরম সুযোগে প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠল। ধরুন, ডুবুরি ওই লোকটাকে অক্সিজেনের সিলিন্ডার তো দিলোই না, উলটো উঠে আসার সময় লোকটার পেটে একটা জোরে লাথি দিয়ে এলো।'

ক্লাসে তখনও পিনপতন নীরবতা। সবাই সাজিদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

স্যার বললেন– 'তো, তাতে কী প্রমাণ হয়, সাজিদ?'

সাজিদ স্যারের দিকে ফিরল। ফিরে বলল– 'Let me finish my beloved sir'।

'Okey, you are permitted. Carry on.' স্যার বললেন।

সাজিদ এবার প্রশ্ন করল– 'স্যার, বলুন তো এই যে এতগুলো ডুবে যাওয়া মানুষগুলোকে ডুবুরি উদ্ধার করে আনল, এর জন্য আপনি নিজে কি কোনো ক্রেডিট পাবেন?'

স্যার বললেন– 'অবশ্যই আমি ক্রেডিট পাব। কারণ, আমি যদি ওই বিশেষ যন্ত্রটি না বানিয়ে দিতাম, তাহলে তো এই লোকগুলোর কেউই বাঁচত না।'

সাজিদ বলল– 'একদম ঠিক স্যার। আপনি অবশ্যই এর জন্য ক্রেডিট পাবেন। কিন্তু পরবর্তী ব্যাপার হচ্ছে, ডুবুরি সবাইকে উদ্ধার করলেও, একজন লোককে সে শত্রুতাবশত উদ্ধার না করে মৃত্যুকূপে ফেলে রেখে এসেছে। আসার সময় তার পেটে একটি জোরে লাথিও দিয়ে এসেছে। ঠিক?'

'হুম।'

'এখন স্যার, ডুবুরির এমন অন্যায়ের জন্য কি আপনি দায়ী হবেন? ডুবুরির এই অন্যায়ের ভাগটা কি সমানভাবে আপনিও ভাগ করে নেবেন?'

স্যার বললেন– 'অবশ্যই না। ওর দোষের ভাগ আমি কেন নেব? আমি তো তাকে এরকম অন্যায় কাজ করতে বলিনি। সেটা সে নিজে করেছে। সুতরাং এর পুরো দায়ভার তাকেই বহন করতে হবে।'

সাজিদ এবার হাসল। হেসে সে বলল– 'স্যার, ঠিক একইভাবে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আপনি যেরকম ডুবুরিকে একটা বিশেষ যন্ত্র বানিয়ে দিয়েছেন, সেরকম সৃষ্টিকর্তাও মানুষকে অনুগ্রহ করে হাত, পা, চোখ, নাক, কান, মুখ, মস্তিষ্ক– এসব দিয়ে দিয়েছেন। সাথে দিয়েছেন একটি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি। এখন এসব ব্যবহার করে সে যদি কোনো ভালো কাজ করে, তবে তার ক্রেডিট স্রষ্টাও পাবেন। ঠিক যে রকম বিশেষ যন্ত্রটি বানিয়ে আপনি ক্রেডিট পাচ্ছেন। আবার সে মানুষ যদি এগুলো ব্যবহার করে কোনো খারাপ কাজ করে, গর্হিত কাজ করে, তাহলে এর দায়ভার স্রষ্টা নেবেন না। যে রকম ডুবুরির ঐ অন্যায়ের দায় আপনার ওপর বর্তায় না। আমি কি বোঝাতে পেরেছি, স্যার?'

ক্লাসে এতক্ষণ ধরে পিনপতন নীরবতা বিরাজ করছিল। এবার ক্লাসের আস্তিকেরা মিলে একসাথে জোরে জোরে হাততালি দেওয়া শুরু করল।

স্যারের জবাবের আশায় সাজিদ স্যারের দিকে তাকিয়ে আছে। স্যার বললেন– 'হুম। আই গট দ্যা পয়েন্ট।' এই বলে স্যার সেদিনের মতো ক্লাস শেষ করে চলে যান।

শূন্যস্থান থেকে স্রষ্টার দূরত্ব

খুব সকালবেলা। সাজিদের কাছে একটি মেইল এসেছে। মেইলটি পাঠিয়েছে তার নাস্তিক বন্ধু বিপ্লব ধর। বিপ্লবদাকে আমিও চিনি। সদাহাস্য এই লোকটার সাথে মাঝে মাঝেই টিএসসিতে দেখা হতো। দেখা হলেই উনি একটি হাসি দিয়ে জিজ্ঞেস করতেন– 'তুই কি এখনও রাতের বেলা ভূত দেখিস?'

বিপ্লবদা মনে হয় হাসিটি প্রস্তুত করেই রাখত। দেখা হওয়া মাত্রই ডেলিভারি দিতেন। বিপ্লবদাকে চিনতাম সাজিদের মাধ্যমে। সাজিদ আর বিপ্লবদা একই ডিপার্টমেন্টের। বিপ্লবদা সাজিদের চেয়ে দুই ব্যাচ সিনিয়র। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রথম দিকে সাজিদ যে নাস্তিক হয়ে গিয়েছিল, তার পেছনের কারিগর বিপ্লবদা। বিপ্লবদা তাকে বিভিন্ন নাস্তিক, অ্যাগনোস্টিকদের বই পড়িয়ে নাস্তিক বানিয়ে ফেলেছিল। সময়ের ব্যবধানে সাজিদ এখন আর নাস্তিক নেই। ইতোমধ্যে বিশ্বাসের দেওয়ালে প্রথম চুমোটি দিয়ে ফেলেছে।

আমি ক্লাস শেষে রুমে ঢুকে দেখলাম সাজিদ বরাবরের মতোই কমপিউটারের সামনে বসে আছে। কী যেন লিখছে। আমাকে দেখামাত্রই বলল– 'তোর দাওয়াত আছে।'

'কোথায়?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

সাজিদ বলল– 'বিপ্লবদা দেখা করতে বলেছেন।'

আমার সাথে ওনার কোনো লেনদেন নেই। আমাকে এভাবে দেখা করতে বলার হেতু কি বুঝলাম না। সাজিদ বলল– 'ঘাবড়ে গেলি নাকি? তোকে একা না, সাথে আমাকেও।'

এই বলে সাজিদ বিপ্লবদার মেইলটি ওপেন করে দেখাল। মেইলটি হুবহু এরকম–

'সাজিদ,

আমি তোমাকে একজন প্রগতিশীল, উদারমনসম্পন্ন, মুক্তমনা ভাবতাম। পড়াশোনা করে তুমি কথিত ধর্মীয় গোঁড়ামি আর অন্ধ বিশ্বাস থেকে বেরিয়ে এসেছিলে।

কিন্তু তুমি যে আবার সেই অন্ধ বিশ্বাসের জগতে ফিরে যাবে– সেটা কল্পনাও করিনি। আজ বিকেলে বাসায় এসো। তোমার সাথে আলাপ আছে।'

আমরা খাওয়া-দাওয়া করে, যোহরের নামাজ পড়ে বিপ্লবদার সাথে দেখা করার জন্য বের হলাম। বিপ্লবদা আগে থাকতেন বনানী, এখন থাকেন কাঁটাবনে। জ্যাম কাটিয়ে আমরা যখন বিপ্লবদার বাসায় পৌঁছলাম, তখন আসরের ওয়াক্ত হয়ে গেছে। বিপ্লবদার সাথে হ্যান্ডসেক করে আমরা বসলাম না।

সাজিদ বলল– 'দাদা, আলাপ একটু পরে হবে। আগে আসরের নামাজটা পড়ে আসি।'

বিপ্লবদা না করলেন না। আমরা বেরিয়ে গেলাম। পার্শ্ববর্তী মসজিদে আসরের নামাজ পড়ে ব্যাক করলাম। বিপ্লবদা ইতোমধ্যেই কফি তৈরি করে রেখেছেন। খুবই উন্নতমানের কফি। কফির গন্ধটা পুরো ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল মুহূর্তেই।

সাজিদ কফি হাতে নিতে নিতে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল– 'জানিস, বিপ্লবদার এই কফি বিশ্ববিখ্যাত। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের কফি। বিপ্লবদা কানাডা থেকে অর্ডার করিয়ে আনেন।'

কফির কাপে চুমুক দিয়ে মনে হলো আসলেই সত্যি। এত ভালো কফি হতে পারে– ভাবাই যায় না। সাজিদ এবার বিপ্লবদার দিকে তাকিয়ে বলল– 'আলাপ শুরু হোক।'

বিপ্লবদার মুখে সদাহাস্য ভাবটা আজকে নেই। ওনার পরম শিষ্যের এরকম অধঃপতনে সম্ভবত মন কিছুটা বিষণ্ন।

বললেন– 'তোমার সিদ্ধান্তের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। তবে তোমাকে একটি বিষয়ে বলার জন্যই আসতে বলেছি। হয়তো তুমি ব্যাপারটি জেনে থাকবে, তবুও।'

সাজিদ কফির কাপে চুমুক দিয়ে বলল– 'জানা বিষয়টাও আপনার মুখ থেকে শুনলে মনে হয় নতুন জানছি। আমি আপনাকে কতটা পছন্দ করি, তা তো আপনি জানেনই।'

বিপ্লবদা কোনো ভূমিকায় গেলেন না। সরাসরি বললেন– 'ওই যে, তোমার সৃষ্টিকর্তা, ওনার ব্যাপারে বলতে চাই। তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র, তুমি হয়তো এ ব্যাপারে জানো। সম্প্রতি বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, এই মহাবিশ্ব সৃষ্টিতে সৃষ্টিকর্তার কোনো ভূমিকা নেই। মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে শূন্য থেকেই। আগে তোমরা, মানে বিশ্বাসীরা বলতে, একটা সামান্য সুঁচও যখন কোনো কারিগর ছাড়া এমনি এমনি তৈরি হতে পারে না, তাহলে এই গোটা মহাবিশ্ব কীভাবে তৈরি হবে আপনা-আপনি? কিন্তু বিজ্ঞান এখন বলছে, এই মহাবিশ্ব শূন্য থেকে আপনা-আপনিই তৈরি হয়েছে। কারও সাহায্য ছাড়াই।'

এই কথাগুলো বিপ্লবদা এক নাগাড়ে বলে গেলেন। মনে হয়েছে তিনি কোনো নিঃশ্বাসই নেননি এতক্ষণ।

সাজিদ বলল– 'অদ্ভুত তো। তাহলে তো আমাকে আবার নাস্তিক হয়ে যেতে হবে দেখছি। হা হা হা হা।'

সাজিদ চমৎকার একটা হাসি দিলো। বিপ্লবদা সেদিকে মনোযোগ দিয়েছেন বলে মনে হলো না। উনি মোটামুটি একটা লেকচার শুরু করেছেন। আমি আর সাজিদ খুব মনোযোগী ছাত্রের মতো ওনার বৈজ্ঞানিক কথাবার্তা শুনছিলাম। তিনি যা বোঝালেন, তার সারসংক্ষেপ ঠিক এরকম।

'পদার্থবিজ্ঞানে নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছে কোয়ান্টাম মেকানিক্স। এই কোয়ান্টাম মেকানিক্সে একটি থিওরি আছে, সেটি হতে 'কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশান।' এই কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশানের মূল কথা হলো, 'মহাবিশ্বে পরম শূন্যস্থান বলে আদতে কিছু নেই। মানে, আমরা যেটাকে 'Nothing' বলে এতদিন জেনে এসেছি, বিজ্ঞান বলছে, আদতে 'Nothing' বলতে কিছুই নেই। প্রকৃতি শূন্যস্থান পছন্দ করে না। তাই যখনই কোনো শূন্যস্থান (Nothing) তৈরি হয়, সেখানে এক সেকেন্ডের বিলিয়ন ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে কণা এবং প্রতিকণা (Matter & Anti-Matter) তৈরি হচ্ছে এবং একটির সাথে অন্যটির ঘর্ষণে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তোমরা কি জানো, কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশানের ধারণা কোথা থেকে এসেছে?'

আমি বললাম– 'না।'

বিপ্লবদা আবার বলতে শুরু করলেন– 'এই ধারণা এসেছে হাইজেনবার্গের বিখ্যাত 'অনিশ্চয়তা নীতি' থেকে। হাইজেনবার্গের সেই বিখ্যাত সূত্রটা তোমরা জানো নিশ্চয়?'

সাজিদ বলল– 'হ্যাঁ। হাইজেনবার্গ বলেছেন, "আমরা কখনও একটি কণার অবস্থান এবং এর ভরবেগের সঠিক পরিমাণ একসাথে একুরেটলি জানতে পারব না। যদি অবস্থান সঠিকভাবে জানতে পারি, তাহলে এর ভরবেগের মধ্যে গলদ থাকবে। আবার যদি ভরবেগ সঠিকভাবে জানতে পারি, তাহলে এর অবস্থানের মধ্যে গলদ থাকবে। দুটো একইসাথে সঠিকভাবে জানা কখনোই সম্ভব না। এটা যে সম্ভব না এটা বিজ্ঞানের অসাড়তা নয়, আসলে এটা হলো কণার ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য।"'

বিপ্লবদা বললেন– 'এক্সাক্টলি। একদম তাই। হাইজেনবার্গের এই নীতিকে শক্তি আর সময়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। হাইজেনবার্গের এই নীতি যদি সত্যি হয়, তাহলে মহাবিশ্বে 'শূন্যস্থান' বলে কিছু থাকতে পারে না। যদি থাকে, তাহলে তার অবস্থান ও ভরবেগ দুটোই শূন্য চলে আসে, যা হাইজেনবার্গের নীতিবিরুদ্ধ।'

এটুকু বলে বিপ্লবদা একটু থামল। পট থেকে কফি ঢালতে ঢালতে বললেন– 'বুঝতেছ তোমরা?'

সাজিদ বুঝছে কিনা জানি না, তবে আমার কাছে ব্যাপারটি দুর্বোধ্য মনে হলেও, বিপ্লবদার উপস্থাপন ভঙ্গিমা সেটাকে অনেকটাই প্রাঞ্জল করে তুলছে। ভালো লাগছে।

বিপ্লবদা কফিতে চুমুক দিলেন। এরপর আবার বলতে শুরু করলেন– 'তাহলে তোমরা যে বলো, বিগ ব্যাং-এর আগে তো কিছুই ছিল না। না সময়, না শক্তি, না অন্য কিছু। তাহলে বিগ ব্যাং-এর বিস্ফোরণটি হলো কীভাবে? এর জন্য নিশ্চয় কোনো শক্তি দরকার? কোনো বাহ্যিক বল দরকার, তাই না? এটা বলে তোমরা স্রষ্টার ধারণাকে জায়েজ করতে। তোমরা বলতে, এই বাহ্যিক বলটা এসেছে স্রষ্টার কাছ থেকে। কিন্তু দেখ, বিজ্ঞান বলছে, এখানে স্রষ্টার কোনো হাত নেই। বিগ ব্যাং হওয়ার জন্য যে শক্তি দরকার ছিল, সেটা এসেছে এই কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশান থেকে। সুতরাং, মহাবিশ্ব তৈরিতে স্রষ্টার অস্তিত্বকে বিজ্ঞান সরাসরি "না" বলে দিয়েছে। আর তোমরা এখনও স্রষ্টা স্রষ্টা করে কোথায় যে পড়ে আছ, তা আমি বুঝতে পারি না।'

এতটুকু বলে বিপ্লবদার চোখমুখ ঝলমলিয়ে উঠল। মনে হচ্ছে, উনি যে উদ্দেশ্যে আমাদের ডেকেছেন, তা সফল হয়ে গেছে। আমরা হয়তো উনার বিজ্ঞানময় এই জ্ঞানগর্ভ লেকচার শুনে এক্ষুনি নাস্তিকতার ওপর ঈমান নিয়ে আসব।

যাহোক, ইতোমধ্যে সাজিদ দুকাপ কফি গিলে ফেলেছে। নতুন এক কাপ ঢালতে ঢালতে সে বলল– 'এই ব্যাপারে স্টিফেন হকিংয়ের বই আছে। নাম– *The Grand Design*। এটা আমি পড়েছি।'

সাজিদের কথা শুনে বিপ্লবদাকে খুব খুশি মনে হলো। তিনি বললেন– 'বাহ, তুমি তাহলে পড়াশোনা স্টপ করোনি? বেশ বেশ! পড়াশোনা করবে। বেশি বেশি পড়বে। যত পড়বে, তত দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা বাড়বে।'

সাজিদ হাসল। হেসে সে বলল– 'কিন্তু দাদা, এই ব্যাপারে আমার কনফিউশন আছে।'
'কোন ব্যাপারে?' বিপ্লবদার প্রশ্ন।

'স্টিফেন হকিং আর লিওনার্ড ম্লোদিনোর বই '-এর ব্যাপারে।'

বিপ্লবদা একটু থতমত খেলো মনে হলো। সম্ভবত মনে মনে বলছেন– এই ছেলে দেখছি খোদার ওপর খোদাগিরি করছে।

তিনি বললেন– 'ক্লিয়ার করো।'

সাজিদ বলল– 'আমি দুই দিক থেকেই এটার ব্যাখ্যা করব। বিজ্ঞান ও ধর্ম। যদি অনুমতি দেন।'

'অবশ্যই।' বিপ্লবদা বললেন।

আমি মুগ্ধ শ্রোতা। গুরু আর প্রাক্তন শিষ্যের তর্ক জমে উঠেছে।

সাজিদ বলল– 'প্রথম কথা হচ্ছে, স্টিফেন হকিংয়ের এই থিওরিটা এখনও 'থিওরি', সেটা 'ফ্যাক্ট' নয়। এই ব্যাপারে প্রথম কথা বলেন বিজ্ঞানী লরেন্স ক্রাউস। তিনি এটা নিয়ে একটি বিশাল সাইজের বই লিখেছিলেন। বইটার নাম ছিল– *A Universe From Nothing*.

অনেক পরে, এখন স্টিফেন হকিংস এটা নিয়ে ওনার *The Grand Design*-এ কথা বলেছেন। ওনার এই বইটা প্রকাশ হওয়ার পর সিএনএনের এক সাংবাদিক হকিংকে জিজ্ঞেস করেছিলেন– 'আপনি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন?'

হকিং বলেছিলেন– 'ঈশ্বর থাকলেও থাকতে পারে, তবে মহাবিশ্ব তৈরিতে তার প্রয়োজন নেই।'

বিপ্লবদা বলল– 'সেটাই। উনি বোঝালেন যে, ঈশ্বর মূলত ধার্মিকদের একটি অকার্যকর বিশ্বাস।'

'হকিং কী বুঝিয়েছেন জানি না, কিন্তু হকিংয়ের ওই বইটি অসম্পূর্ণ। কিছু বিতর্ক আছে।'

বিপ্লবদা কফির কাপ রাখতে রাখতে বললেন– 'বিতর্ক মানে?'

'দাঁড়ান, বলছি। বিতর্ক মানে, উনি কিছু বিষয় বইতে পরিষ্কার করেননি। যেহেতু এটা বিজ্ঞান মহলে প্রমাণিত সত্য নয়, তাই এটা অনেক বিতর্কিত হয়েছে। উনার বইতে যে বিতর্কগুলো আছে, সেগুলো ধারাবাহিকভাবে বলছি।

বিতর্ক নাম্বার : ০১

'হকিং বলেছেন, শূন্য থেকেই কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশানের মাধ্যমে বস্তুকণা তৈরি হয়েছে এবং সেটা মহাকর্ষ বলের মাধ্যমে নিউট্রালাইজ হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হলো– শূন্য বলতে হকিং কি একদম Nothing (কোনো কিছুই নেই) বুঝিয়েছেন, নাকি Quantum Vacuum (বস্তুর অনুপস্থিতি) বুঝিয়েছেন, সেটা পরিষ্কার করেননি। হকিং বলেছেন, শূন্যস্থানে বস্তুকণার মাঝে কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশান হতে হলে সেখানে মহাকর্ষ বল প্রয়োজন। কিন্তু ওই শূন্যস্থানে (যখন সময় আর স্থান তৈরি হয়নি) ঠিক কোথা থেকে এবং কীভাবে মহাকর্ষ বল এলো, তার কোনো ব্যাখ্যা হকিং দেননি।

বিতর্ক নাম্বার : ০২

'হকিং তার বইতে বলেছেন, মহাবিশ্ব তৈরি হয়েছে একদম শূন্য থেকে, কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশানের মাধ্যমে। তখন সময় (Time)-এর আচরণ আজকের সময়ের মতো ছিল না। তখন সময়ের আচরণ ছিল স্থান (Space)-এর মতো। কারণ, এই ফ্ল্যাকচুয়েশান হওয়ার জন্য প্রাথমিকভাবে সময়ের দরকার ছিল না, স্থানের দরকার ছিল। কিন্তু হকিং তার বইতে এই কথা বলেননি যে, যে সময় (Time) মহাবিশ্বের একদম শুরুতে স্থান-এর মতো আচরণ করেছে, সেই-সময় পরে ঠিক কবে আর কখন থেকে আবার Time-এর মতো আচরণ শুরু করল এবং কেন?'

আমি বিপ্লবদার মুখের দিকে তাকালাম। তার চেহারার উৎফুল্ল ভাবটা চলে গেছে। সাজিদ বলে যাচ্ছে–

বিতর্ক নাম্বার : ০৩

'পদার্থবিদ্যার যে সূত্র মেনে কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশান হয়ে মহাবিশ্ব তৈরি হলো, তখন শূন্যাবস্থায় পদার্থবিদ্যার এই সূত্রগুলো বলবৎ থাকে কী করে? এটার ব্যাখ্যা হকিং দেননি।

বিতর্ক নাম্বার : ০৪

'আপনি বলেছেন, প্রকৃতি শূন্যস্থান পছন্দ করে না। তাই শূন্যস্থান পূরণ করতে আপনা-আপনিই কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশান হয়ে মহাবিশ্ব তৈরি হয়েছে। আমার প্রশ্ন হলো– যেখানে আপনি শূন্যস্থান নিয়ে কথা বলছেন, যখন সময় ছিল না, স্থান ছিল না, তখন আপনি প্রকৃতি কোথায় পেলেন?'

সাজিদ হকিংয়ের বইয়ের পাঁচ নাম্বার বিতর্কের কথা বলতে যাচ্ছিল। তাকে থামিয়ে দিয়ে বিপ্লবদা বললেন– 'ওকে, ওকে বুঝলাম। আমি বলছি না যে, এই জিনিসটা একেবারে সত্যি। এটা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হবে। আলোচনা-সমালোচনা হবে। আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে। তারপর ডিসাইড হবে যে, এটা ঠিক না ভুল।'

সাজিদের কাছে বিপ্লবদার এরকম মৌন পরাজয় আমাকে খুব তৃপ্তি দিলো। মনে মনে বললাম– ইয়েস সাজিদ, ইউ ক্যান।

সাজিদ বলল– 'হ্যাঁ, সে পরীক্ষা চলতে থাকুক। যদি কোনোদিন এই থিওরি সত্যিও হয়ে যায়, তাহলেও আমাকে ডাক দিয়েন না দাদা। কারণ, আমি আল-কুরআন দিয়েই এটা প্রমাণ করে দিতে পারব।'

সাজিদের এই কথা শুনে আমার হেঁচকি উঠে গেল। কী বলে? এতক্ষণ যেটাকে গলদপূর্ণ বলেছে, সেটাকে আবার কুরআন দিয়ে প্রমাণ করবে বলছে? কীভাবে সম্ভব?

বিপ্লবদা বুঝল না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন– 'কীরকম?'

সাজিদ হাসল। বলল– 'শূন্য থেকেই মহাবিশ্ব সৃষ্টির কথা আল-কুরআনে বলা আছে দাদা।'

আমি আরও অবাক হতে থাকলাম। কী বলে এই ছেলে?

সে বলল– 'আমি বলছি না যে আল কুরআন কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশানের কথাই বলেছে। কুরআন যার কাছ থেকে এসেছে, তিনি তাঁর সৃষ্টি জগতের সৃষ্টির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এখন সেটা বিগ ব্যাং এলেও পালটাবে না, কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশান থিওরি এলেও পালটাবে না, একই থাকবে।'

বিপ্লবদা বলল– 'কুরআনে কী আছে বললে যেন?'

সাজিদ বলল– 'সূরা বাকারার ১১৭ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে– 'যিনি মহাকাশ ও পৃথিবীকে অনস্তিত্ব হতে অস্তিত্বে আনেন (এখানে মূল শব্দ 'বাদিয়্যু/Originator সেখান থেকেই অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের ধারণা) এবং যখন তিনি কিছু করবার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন শুধু বলেন "হও", আর তা হয়ে যায়।'

'Creator of the heavens and the earth from nothingness, He has only to say when He wills a thing, Be, and it is.'

'দেখুন, আমি আবারও বলছি : আমি এটা বলছি না যে, আল্লাহ তা'আলা এখানে কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশানের কথাই বলেছেন। তিনি তার সৃষ্টির কথা বলেছেন। তিনি 'অনস্তিত্ব' (Nothing) থেকে 'অস্তিত্ব' (Something) এনেছেন। এমন না যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর হাত দিয়ে প্রথমে মহাবিশ্বের ছাদ বানালেন। তারপর তাতে সূর্য, চাঁদ, গ্যালাক্সি এগুলো একটা একটা করে বসিয়ে দিয়েছেন। তিনি কেবল নির্দেশ দিয়েছেন।

‘হকিংও একই কথা বলেছেন। কিন্তু তারা বলছে এটা এমনি এমনি হয়ে গেছে; শূন্য থেকেই। আল্লাহ তায়ালা বলছেন, না, এমনি হয়নি। আমি যখন নির্দেশ করেছি “হও” (কুন), তখন তা হয়ে গেল।

‘হকিং ব্যাখ্যা দিতে পারছে না– এই কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশানের জন্য মহাকর্ষ বল কোথা থেকে এলো; “সময়” কেন, কীভাবে “স্থান” হলো, পরে আবার সেটা “সময়” হলো। কিন্তু আমাদের স্রষ্টা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ‘হতে’, আর তা হয়ে গেল।

‘ধরুন, একজন ম্যাজিশিয়ান ম্যাজিক দেখাচ্ছে। ম্যাজিশিয়ান বসে আছে স্টেজের এক কোনায়। কিন্তু সে তার চোখের ইশারায় ম্যাজিক দেখাচ্ছে। দর্শক দেখছে, খালি টেবিলের ওপরে হঠাৎ একটা কবুতর তৈরি হয়ে গেল এবং সেটা উড়েও গেল। দর্শক কী বলবে এটা কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশানের মাধ্যমে হয়ে গেছে? না, বলবে না। এর পেছনে ম্যাজিশিয়ানের কারসাজি আছে। সে স্টেজের এক কোনা থেকে চোখ দিয়ে ইশারা করেছে বলেই এটা হয়েছে।

‘সৃষ্টির এই সূচনার ব্যাপারটাও এমন। তিনি শুধু বলেছেন, “হও”, আর মহাবিশ্ব আপনা-আপনিই হয়ে গেল। আপনাদের সেই শূন্যস্থান থেকে স্রষ্টার দূরত্ব কেবল ওই “হও” পর্যন্তই।

মাগরিবের আজান পড়তে শুরু করেছে। বিপ্লবদাকে অনেকটাই হতাশ হতে দেখলাম। আমরা বললাম– ‘আজ তাহলে উঠি?’

উনি একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন– ‘এসো।’

আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আমি অবাক হয়ে সাজিদের দিকে তাকিয়ে আছি। কে বলবে এই ছেলেটা গত ছয় মাস আগেও নাস্তিক ছিল। নিজের গুরুকেই কীরকম কুপোকাত করে দিয়ে এলো! কুরআনের সূরা বাকারার ১১৭ নম্বর আয়াতটি কত শতবার পড়েছি, কিন্তু এভাবে কোনোদিন ভাবিনি। আজকে এটা সাজিদ যখন বিপ্লবদাকে বুঝিয়েছিল, মনে হচ্ছিল আজকেই নতুন শুনছি এই আয়াতের কথা। গর্ব হতে লাগল আমার।

তাদের অন্তরে আল্লাহ মোহর মেরে দেন : সত্যিই কি তাই

বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে বসে বই পড়ছিলাম।

সাজিদ পড়ছিল অ্যান্থনি মাসকারেনহাসের *The Legacy Of Blood* বইটি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ওপর বিদেশি সাংবাদিকের লেখা বই। সাজিদের অনেক দিনের ইচ্ছে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর সে একটা ডকুমেন্টারি তৈরি করবে। তাই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যত বই আছে, সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছে সে।

আমি অবশ্য সাজিদকে সঙ্গ দেওয়ার জন্যই রয়ে গেছি। এসব বই-টই পড়ার ব্যাপারে আমার যথেষ্ট অনীহা আছে। থার্ড পিরিয়ডে সাজিদ ফোন করে বলল ক্লাস শেষে যেন ওর সাথে দেখা করি। দেখা করতে এসেই আটকে গেছি। সোজা নিয়ে এলো লাইব্রেরিতে। মোটা মোটা বইগুলো নিয়ে সে বসে পড়েছে। খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ছে আর গুরুত্বপূর্ণ লাইনগুলো ডায়েরিতে টুকে নিচ্ছে।

আমি আর কী করব? সাজিদকে মুখের ওপর 'তুই বসে থাক' বলে চলেও আসা যাবে না। তাহলেই হয়েছে।

আমি ঘুরে ঘুরে সেলফে সাজিয়ে রাখা বইগুলো দেখছি। হুমায়ূন আহমেদের একটি বই হাতে নিলাম। বইটির নাম– *দিঘির জলে কার ছায়া গো*।

হুমায়ূন আহমেদ নামের এই ভদ্রলোক বাংলাদেশে বেশ জনপ্রিয় লেখক। যদিও ওনার তেমন বই আমি পড়িনি, কিন্তু সাজিদের মুখে ওনার বেশ প্রশংসা শুনি। ওনার বেশকিছু কালজয়ী চরিত্র আছে। একবার নাকি ওনার নাটকের একটি পট পালটানোর জন্য মানুষ মিছিল নিয়েও বেরিয়েছিল। বাব্বা! কী সাংঘাতিক!

দিঘির জলে কার ছায়া গো নামের বইটি উলটাতে লাগলাম। উলটাতে উলটাতে একটি জায়গায় আমার চোখ আটকে গেল। বিবর্তনবাদের জনক চার্লস ডারউইনের ব্যাপারে কিছু একটা লেখা। পড়তে শুরু করলাম–

আহসানকে পেয়ে শওকত সাহেব আনন্দিত। তিনি নতুন একটা বই পড়ছেন।
বইয়ে বিবর্তনবাদের জনক ডারউইন সাহেবকে ধরাশায়ী করা হয়েছে। তাঁর পূর্বপুরুষ বানর– এটা তিনি মেনে নিতেই পারতেন না। এখন সমস্যার সমাধান হয়েছে। তিনি আহসানের দিকে ঝুঁকে এসে বললেন– 'তুমি ডারউইনবাদে বিশ্বাস করো?'

আহসান বলল– 'জি চাচা, করি।'

'তোমার বিশ্বাস তুমি এখন যেকোনো একটা ভালো ডাস্টবিন দেখে ফেলে আসতে পারো।'

আহসান বলল– 'জি, আচ্ছা।'

'পুরো বিষয়টা না শুনেই জি আচ্ছা বলবে না। আগে পুরো বিষয়টা শোনো।'

আহসান হতাশ ভঙ্গিতে পুরো বিষয়টা শোনার জন্য প্রস্তুত হলো। সহজে এই বিরক্তিকর মানুষটার কাছ থেকে ছাড়া পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না।

শওকত সাহেব বললেন– 'তোমাদের ডারউইনের থিওরি বলে পাখি এসেছে সরীসৃপ থেকে।

'তুমি এখন একটা সাপ ও ময়ূর পাশাপাশি রাখো। চিন্তা করো যে, ময়ূরের পূর্বপুরুষ সাপ, যে সাপ এখন ময়ূরের প্রিয় খাদ্য। বলো, তোমার কিছু বলার আছে?'

'এই মুহূর্তে কিছু বলার নেই চাচা।'

'মনে মনে দশের ওপরে ৯৫০টা শূন্য বসাও।
এই বিশাল প্রায় অসীম সংখ্যা দিয়ে ১ কে ভাগ করো। কি পাবে জানো? শূন্য। এটা হলো অ্যাটমে অ্যাটমে ধাক্কাধাক্কি করে DNA অণু তৈরির সম্ভাবনা। মিলার নামে কোনো বিজ্ঞানীর নাম শুনেছ? ছাগলটাইপ সাইনটিস্ট।'

'না চাচা, শুনিনি।'

'ওই ছাগলটা ১৯৫০ সনে একটা এক্সপেরিমেন্ট করে অন্য ছাগল সাইন্টিস্টদের মধ্যে হইচই ফেলে দিয়েছিল। ছাগলটা করেছে কী, ল্যাবরেটরিতে আদি পৃথিবীর আবহাওয়া তৈরি করে ঘন ঘন ইলেকট্রিক কারেন্ট পাস করেছে। কিছু প্রোটিন অণু তৈরি করে বলেছে– এভাবেই পৃথিবীতে প্রাণের শুরু। প্রাণ সৃষ্টিতে সৃষ্টিকর্তার কোনো প্রয়োজন নেই। এখন সেই ছাগল মিলারকে নিয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে হাসাহাসি চলে। Life ম্যাগাজিনে কী লেখা হয়েছিল পড়ে শোনাই।'

'চাচা, আরেক দিন শুনি? জটিল কিছু শোনার জন্য আমি এ মুহূর্তে মানসিকভাবে তৈরি নই।'

'জটিল কিছু বলছি না। জলবৎ তরলং। মন দিয়ে শোনো।'

শওকত সাহেব পড়তে শুরু করলেন। আহসান হতাশ চোখে জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল...

এতটুকু পড়ে আমি বেশ আনন্দ পেলাম। লেখক হুমায়ূন আহমেদ এখানে ব্যাটা ডারউইনকে একহাত দিলেন। শওকত সাহেবের মতো আমিও কোনোভাবেই মানতে পারি না যে, আমাদের পূর্বপুরুষ বানর। ভাবতেই ঘেন্না লাগে!

বইটি নিয়ে আমি সাজিদের কাছে গেলাম। গিয়ে দেখি সে ব্যাগপত্র গোছানো শুরু করেছে। সে বলল– 'চল, বাসায় যাব।'

আমি তাকে হাতের বইটি দেখিয়ে বললাম– 'এই বইটা পড়েছিস? মজার একটি কাহিনি আছে। হয়েছে কী জানিস...?'

আমার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে সাজিদ বলল– 'শওকত সাহেব নামের এক ভদ্রলোক আহসান নামের একটি ছেলের সামনে ডারউইনের গোষ্ঠী উদ্ধার করেছে, তাই তো?'

আমি অবাক হলাম। বললাম– 'হ্যাঁ। কিন্তু আমি এই ব্যাপারে বলব কী করে বুঝলি?'

সাজিদ ব্যাগ কাঁধে নিতে নিতে বলল– 'এটা ছাড়া এই বইতে আর তেমন বিশেষ কিছু নেই, যেটা দেখাতে তুই এভাবে আমার কাছে ছুটে আসবি। তাই অনুমান করলাম।'

আমি আর কিছুই বললাম না। বইটি সেলফে রেখে দিয়েই হাঁটা ধরলাম।

সিঁড়ির কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ বিপ্লবদার সাথে দেখা।

ওনার সাথে শেষবারের মতো দেখা হয়েছিল ওনার বাসায়। সেবার সাজিদ আর বিপ্লবদার মধ্যে কোয়ান্টাম ফিজিক্স নিয়ে যা বিতর্ক হয়েছিল, সেটা দেখার মতো ছিল। বিতর্কে বিপ্লবদা সাজিদের কাছে গো-হারা হেরেছিল। সেটা ভাবতেই এখনও আমার পৈশাচিক আনন্দ হয়।

আমাদের দেখেই বিপ্লবদা হেসে দিলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললেন।

এর মধ্যে হঠাৎ করে বৃষ্টি চলে এলো। মধ্যাকাশে সূর্য্যি মামা তখনও বহাল তবিয়তে জ্বলজ্বল করছে, আবার ওদিকে বৃষ্টির বিশাল বিশাল ফোঁটা। গ্রাম্য লোকজনের কাছে এই বৃষ্টির একটি মজার ব্যাখ্যা আছে। তারা বলে, শেয়ালের বিয়ে হলে এরকম বৃষ্টি হয়। রোদের মধ্যেই বৃষ্টি। শেয়াল প্রজাতির মধ্যে বিয়ের প্রচলন আছে কিনা কে জানে।

বিপ্লবদাসহ আমরা ক্যানটিনে ঢুকলাম। বৃষ্টি কমলে বের হতে হবে।

সাজিদ তিনকাপ চা অর্ডার করল। এরপর বিপ্লবদার দিকে তাকিয়ে বলল– 'দাদা, চা খেতে অসুবিধে নেই তো?'

'না না, ইট'স ওকে।' বিপ্লবদা উত্তরে বলল।

এরপর আবার বিপ্লবদা বলল– 'সাজিদ, তোমার সাথে একটি ব্যাপারে আলাপ করার ছিল।'

ততক্ষণে চা চলে এসেছে। বৃষ্টির মধ্যে গরম-গরম ধোঁয়া উঠা চায়ের কাপে চুমুক দেওয়ার ফ্লেভারটাই অন্যরকম। সাজিদ তার কাপে চুমুক দিতে দিতে বলল– 'হ্যাঁ দাদা, বলুন। কোন টপিক?'

বিপ্লবদা বলল– 'ওই যে, তোমরা যে বইটাকে স্রষ্টার বাণী বলো, সেটা নিয়ে। কুরআন।'

সাজিদ বলল– 'সমস্যা নেই। বলুন কী বলবেন?'

বিপ্লবদা বললেন– ‘কুরআনে একটা সূরা আছে। সূরাটার নাম বাকরা।’

সাজিদ বলল– ‘সূরাটির নাম বাকরা নয়, বাকারা। বাকারা অর্থ– গাভী। ইংরেজিতে The Cow.’

‘ওই আর কী। ওই সূরার ৬-৭ নম্বর লাইনগুলো তুমি কি পড়েছ?’

‘পুরো কুরআনই আমরা মাসে কয়েকবার করে পড়ি। এটা মার্কস কিংবা প্লেটোর রচনা নয় যে, একবার পড়া হয়ে গেলেই সেলফে আজীবনের জন্য সাজিয়ে রাখব।’

বিপ্লবদা বললেন– এই লাইনগুলোতে বলা হচ্ছে:

‘Verily, those who disbelieve, it is the same to them whether you warn them or do not warn them, they will not believe.
Allah has set a seal on their hearts & on their hearings and on their eyes there is a covering. Theirs will be a great torment.’

এরপর বিপ্লবদা সেটার বাংলা অর্থ করে বললেন–

‘নিশ্চয় যারা অস্বীকার করে, তাদের আপনি সাবধান করুন আর না করুন, তারা স্বীকার করবে না। আল্লাহ তায়ালা তাদের হৃদয়ে এবং তাদের কর্ণ কুহরে মোহর মেরে দিয়েছেন; তাদের দৃষ্টির ওপর আবরণ টেনে দিয়েছেন। তাদের জন্য আছে ভয়াবহ শাস্তি।’

এইটুকু বলে বিপ্লবদা থামলেন। সাজিদ বলল– ‘What's wrong with these verses?’

বিপ্লবদা বললেন– ‘দেখ, এখানে বলছে কাফিরদের হৃদয়ে আর কানে তোমাদের আল্লাহ মোহর, আই মিন সিল মেরে দেয়। সিল মারা মানে তালাবদ্ধ করে দেওয়া, তাই না?’

‘হু।’

‘এখন কাফিরদের হৃদয়ে আর কানে যদি সিল মারা থাকে, তারা তো সত্যের বাণী, আই মিন তোমরা যেটাকে ধর্মের বাণী বলো আর কী, সেটা বুঝতে পারবে না। উপলব্ধি করতে পারবে না। আল্লাহ যেহেতু তাদের হৃদয়ে আর কানে সিল মেরে দিচ্ছে, তাই তারা ধর্মের বাণীগুলো বুঝতে পারছে না। তাই তারা কাফির থেকে যাচ্ছে। নাস্তিক হচ্ছে। তাদের কী দোষ বলো? আল্লাই তো চান না তারা আস্তিক হোক। চাইলে তিনি নিশ্চয় হৃদয়ে আর কানে সিল মেরে দিতেন না। আবার শেষে এসে বলছে, তাদের জন্য আজাব অপেক্ষা করছে। এটা কেমন কথা? একদিকে সিল মেরে দিয়ে সত্য বোঝার থেকে দূরে রাখছেন, আবার ওই দিকে আজাবও প্রস্তুত করে রাখছেন। ব্যাপারটা কি ঠিক? বলো?’

বিপ্লবদার কথাগুলো আমার কাছে খুব যৌক্তিক মনে হলো। আসলেই তো। এই আয়াতগুলো নিয়ে তো এভাবে কোনোদিন ভাবিনি। আল্লাহ তায়ালা একদিকে বলেছেন, কাফিরদের অন্তরে মোহর মেরে দেন, আবার তাদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থাও করে রেখেছেন। ব্যাপারটা কী?

সাজিদ মুচকি হাসল। চায়ের কাপে শেষ চুমুকটুকু দিয়ে বলল– 'দাদা, ইসলামের ইতিহাস পড়লে আপনি একশ্রেণির মির জাফরদের কথা জানতে পারবেন। এরা করত কি জানেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আসত। হাতের মুঠির মধ্যে পাথর নিয়ে বলত– মুহাম্মাদ, আমার হাতে কী আছে বলতে পারলে আমি এক্ষুনি ইসলাম কবুল করব। দেখি তুমি কেমন নবি?

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসতেন। হেসে বলতেন– তোমার হাতের জিনিসই বলুক সেগুলো কী।

'তখন পাথরগুলো কথা বলতে শুরু করত। এটা দেখে সেই লোকগুলো খুব অবাক হতো। অবাক হয়ে বলত– এ তো সাক্ষাৎ জাদুকর। এই বলে পালাত। অথচ তারা বলেছিল হাতে কি আছে বলতে পারলে ইসলাম কবুল করবে। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের পরীক্ষায় পাশ করে গেলে তারা তাকে জাদুকর, জ্যোতিষী ইত্যাদি বলে চলে যেত। মুনাফিকি করত। এসব আয়াতে মূলত এই শ্রেণির কাফিরদের কথাই বলা হয়েছে। যাদের সামনে সত্য উদ্‌ঘাটিত হওয়ার পরও তারা তা অস্বীকার করে।'

বিপ্লবদা বললেন– 'কিন্তু অন্তরে মোহর মেরে দিয়ে তাদের সত্য জানা থেকে বঞ্চিত করে, আবার তাদের শাস্তি দেওয়াটা কি ঠিক?'

'মোহর আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছে করে মেরে দেন না। এটা সিস্টেমেটিক্যালি হয়ে যায়।'

বিপ্লবদা হাসা শুরু করলেন। বললেন– 'Very Interesting! সিস্টেমেটিক্যালি সিল পড়ে যায়? হা হা হা।'

সাজিদের এই কথাটা আমার কাছেও শিশুসুলভ মনে হলো। সিস্টেমেটিক্যালি সিল পড়ে যায়? আল্লাহ তায়ালা মারেন না। এটা কেমন কথা? আয়াতে তো স্পষ্টই আছে– 'আল্লাহ তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেন।'

সাজিদ বলল– 'দাদা, ধরুন, আমি বললাম, যারা খাবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছে, আপনি তাদের খেতে বলুন আর না বলুন, তারা কোনোভাবেই খাবে না। আল্লাহ তায়ালা তাদের দেহ শুকিয়ে দেন। তাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেন। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন অসুখ।

'খেয়াল করুন– এখানে তারা অসুস্থ হচ্ছে, তাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে, তারা কঠিন অসুখে পড়তে যাচ্ছে– কেন এসব হচ্ছে? আল্লাহ তায়ালা কি ইচ্ছা করেই তাদের সাথে এগুলো করছেন? নাহ। এগুলো তাদের কর্মফল। তাদের যতই জোর করা হোক, তারা যখন কোনোভাবেই খাবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছে, তখন সিস্টেমেটিক্যালি না খাওয়ার ফলে তাদের শরীর শুকিয়ে যাবে, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাবে। তারা কঠিন রোগে পড়বে। এসব কিছুর জন্য তারাই দায়ী। কিন্তু সিস্টেমটা আল্লাহ তায়ালাই চালাচ্ছেন। আল্লাহ তায়ালা একটি সিস্টেম রেডি করে দিয়েছেন। আপনি না খেলে আপনার শরীর আল্লাহ তায়ালা শুকিয়ে দেবেন।

আপনার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেবেন। দিন শেষে, আপনার একটি কঠিন রোগ হবে। এটা একটা সিস্টেম। এই সিস্টেমে আপনি তখনই পড়বেন, যখন আপনি নিজ থেকে খাবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবেন।

'ঠিক সেভাবেই, যারা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে যে, তাদের সামনে যত প্রমাণ, যত দলিলই আসুক, তারা সত্যকে মেনে নেবে না, অস্বীকার করবেই করবে, তাদের অন্তরে আর কানে সিস্টেমেটিক্যালি একটি সিল পড়ে যাচ্ছে। না খাওয়ার ফলে আপনি যেভাবে শুকিয়ে যান, আপনার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, আপনার কঠিন অসুখ হয়। ঠিক সেভাবে, বিশ্বাস করবেন না বলে সিদ্ধান্ত যখন নিয়েই ফেলেছেন, তখন আপনার অন্তরে, কানে সিল পড়ে যাচ্ছে, আর দিন শেষে, আপনার জন্য অপেক্ষা করছে কঠিন অসুখ, আই মিন আজাব। এর জন্য আল্লাহ তায়ালাকে ব্লেইম করা হবে কেন?'

সাজিদ একনাগাড়ে বলে গেল কথাগুলো। বিপ্লবদার মুখ খানিকটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তিনি সম্ভবত বুঝে গেছেন ব্যাপারটা।

আমি বললাম– 'বাব্বা! কী দিয়ে কী বুঝিয়ে দিলি'রে ভাই! আমি হলে তো হ-য-ব-র-ল করে ফেলতাম।'

সাজিদ মুচকি হাসল।

বৃষ্টি অনেকক্ষণ আগেই থেমে গেছে। আমরা বিপ্লবদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

মুশরিকদের যেখানেই পাও হত্যা করো... অতঃপর

নীলাঞ্জনদা মনে-প্রাণে একজন খাঁটি বাংলাদেশি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা মুক্তি সংগ্রামকে তিনি কোনো কিছুর সাথে কম্প্রোমাইজ করতে রাজি নন। সাজিদের সাথে নীলাঞ্জনদার খুবই ভালো সম্পর্ক। নীলাঞ্জনদাকে আমরা ভালোবেসে নিলুদা বলেই ডাকি। উনি একাধারে কবি, রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিক।

আজকে সাজিদের সাথে নিলুদার একটি বিশেষ আলাপ হবে। কয়েকদিন আগে নিলুদা ব্লগে আল-কুরআনের একটি আয়াতকে 'সন্ত্রাসবাদী আয়াত' বলে কটাক্ষ করে পোস্ট করেছেন। সে ব্যাপারে সুরাহা করতে নিজ থেকেই নিলুদার বাসায় যাচ্ছি আমরা।

আমরা বিকেল চারটায় নিলুদার বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। ওনার বাসায় এর আগে কখনো আসিনি। ওনার সাথে দেখা হতো প্রেসক্লাব আর বিভিন্ন প্রোগ্রামে। তবে উনি যে নীলক্ষেতে থাকেন, সেটা জানি।

নীলক্ষেতে এসে সাজিদ নিলুদাকে ফোন দিলো। ওপাশ থেকে সুন্দর একটি রিংটোন বেজে উঠল। রিংটোনে সেট করা ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের সেই বিখ্যাত ভাষণ।

সাজিদ ফোনের লাউড স্পিকার অন করে দিলো। আমরা আবার শুনলাম, বঙ্গবন্ধুর সেই চিরচেনা ভাষণ। বঙ্গবন্ধু বলছেন– 'আমরা তাদের ভাতে মারব, আমরা তাদের পানিতে মারব। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম, আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

পরপর দুবার রিং হওয়ার পর তৃতীয়বারে নিলুদা ফোন রিসিভ করলেন। সাজিদকে নিলুদা ভালোভাবে বাসার ঠিকানা বুঝিয়ে দিলেন। আমরা ঠিকঠাক পৌঁছে গেলাম।

বাইরে থেকে কলিংবেল বাজতেই বুড়োর মতো এক ভদ্রলোক দরজা খুলে দিলো। আমরা ভেতরে গেলাম।

বলে নিই, আমরা যে উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি, সেটা নিলুদাকে জানানো হয়নি। নিলুদার একটি গুণের কথা বলা হয়নি। কবিতা লেখা এবং সাংবাদিকতার পাশাপাশি নিলুদা খুব ভালো ছবিও আঁকেন।

আমরা ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই বুড়ো লোকটি আমাদের সোজা নিলুদার রুমে নিয়ে গেল। মনে হয়, ওনার ওপর এই নির্দেশই ছিল।

আমরা নিলুদার রুমে এসে দেখি উনি ছবি আঁকছেন। মুক্তিযুদ্ধের ছবি। আঁকা প্রায় শেষ হয়ে গেছে।

জলপাই রঙের পোশাকের একজন মিলিটারি। মিলিটারির বাম হাতে একটি রাইফেল। একজন অর্ধনগ্ন মহিলা। মহিলার চুল খোলা। মহিলা বেঁচে নেই। মিলিটারিটা মহিলাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মনে হয় ভাগাড়ে নিক্ষেপ করবে– এরকম কিছু। পাশেই একটি ডাস্টবিন টাইপ কিছু। চারটে কাক বসে আছে সেটার ওপর। জয়নুলের 'দুর্ভিক্ষ' ছবিটার মতোই।

আমাদের দিকে না ফিরেই নিলুদা বললেন– 'কী রে, এত ঘটা করে দেখা করতে এসেছিস যে?'

সাজিদ বলল– 'ও মা, তোমার সাথে দেখা হয় না কতদিন, দেখতে মন চাইল বলে চলে এলাম। ডিস্টার্ব করেছি বুঝি?'

'আরে না না, তা বলিনি।' এটুকু বলে নিলুদা ঘাড় ঘুরিয়ে আমাদের দিকে তাকাল। আমাকে দেখে নিলুদা বলে উঠল– 'আরিফ না?'

'হু', সাজিদ বলল।

'ওরে বাবা! আজ দেখি আমার বাসায় চাঁদের হাট। তুমি তো জস্পেশ কবিতা লিখ ভাই আরিফ। বিচিত্রায় তোমার কবিতা আমি প্রায়ই পড়ি।'

নিলুদার মুখে এরকম কথা শুনে আমি লজ্জায় মরে যাচ্ছিলাম। সাজিদ বলল– 'জানো দাদা, তাকে কত করে বলি, বইমেলার জন্য কবিতার একটা পাণ্ডুলিপি রেডি কর। কিন্তু সে বলে, ওর নাকি ভয় করে। দেখ তো দাদা।'

নিলুদা বলল– 'হ্যাঁ হ্যাঁ, পান্ডুলিপি রেডি করো। একবার বই বের হয়ে গেলে দেখবে ভয় সব দৌড়ে পালাবে। তোমার লেখার হাত দারুণ। আমি পড়ি তো। বেশ ভালো লিখ।'

সাজিদ বলল– 'দাদা, ওটা কি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ছবি? যেটা আঁকছ?'

'হু', নিলুদার উত্তর।

'আচ্ছা দাদা, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমার বিশেষ পড়াশোনা নেই। তুমি তো আবার এই লাইনের। আজ তোমার কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনব।'

নিলুদা মুচকি হাসলেন। তুলির শেষ আঁচড়খানা দিয়ে খাটের ওপর উঠে বসলেন। আমরা দুজন ততক্ষণে দুটো চেয়ারে বসে পড়েছি।

বুড়ো ভদ্রলোক ট্রেতে কফি নিয়ে এসেছেন। নিলুদা কফিতে চুমুক দিতে দিতে মুক্তিযুদ্ধের গল্প বলা শুরু করলেন–

‘১৯৭১ সাল। পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে চরমভাবে নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত হচ্ছিল বাঙালিরা। যখনই তারা নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য সোচ্চার হয়েছে, তখনই পাকিস্তানিরা বাঙালিদের ওপর চালিয়েছে অত্যাচার, নির্যাতন।’

নিলুদার কণ্ঠ ভারী হয়ে এলো। মুক্তিযুদ্ধের আলাপ উঠলেই উনি এরকম আবেগপ্রবণ হয়ে যান। তিনি বলে যাচ্ছেন– ‘এই অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রা এতই ভয়াবহ হয়ে উঠল যে, বাঙালিরা শেষ পর্যন্ত নিজেদের এবং নিজেদের মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে বাধ্য হলো।

‘তখন চলছে উলটাল মার্চ মাস। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলা ও বাঙালি জাতির কর্ণধার, ইতিহাসের বরপুত্র, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে সশস্ত্র যুদ্ধের ডাক দিলেন।’

সাজিদ বলল– ‘দাদা, তোমার ফোনের রিংটোন আবার একবার শুনি তো প্লিজ। আমরা তাদের ভাতে মারব, “আমরা তাদের পানিতে মারব”। বাবারে! কী সাংঘাতিক কথা।’

নিলুদা কপালের ভাঁজ দীর্ঘ করে বললেন– ‘সাংঘাতিক বলছিস কেন? বরং বল, এটিই হলো বাঙালির মহাকাব্য। সেদিন এরকম করে বাঙালিদের অনুপ্রাণিত না করলে আমরা কি স্বাধীনতার স্বাদ পেতাম?’

‘তাই বলে মেরে ফেলার কথা? এটা তো আইন হাতে তুলে নেওয়ার মতো ব্যাপার।’ সাজিদ বলল।

নিলুদা বলল– ‘যেখানে নিজেদের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হওয়ার পথে, সেখানে তুই আইন বানাচ্ছিস? যুদ্ধের ময়দানে কোনো আইন চলে না।’

‘তারপর?’

‘বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালিরা ঝাঁপিয়ে পড়ল যুদ্ধে।’

আমি বললাম– ‘তারা অত্যাচারী পাকিস্তানিদের মারল এবং মরল, তাই না?’

‘হ্যাঁ।’

‘যুদ্ধের পরে “আমরা তাদের ভাতে মারব, পানিতে মারব” অথবা “যার যা কিছু আছে, তা-ই নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ো” এরকম কথার জন্য বঙ্গবন্ধুকে কি জেল খাটতে হয়েছে? কিংবা কেউ তাকে সন্ত্রাসের উসকানিদাতা বা খুনের মদদদাতা হিসেবে ব্লেইম করেছে?’ সাজিদ জিজ্ঞেস করল।

‘তোর মাথায় কি গোবর নাকি রে সাজিদ? এটা কোনো কথা বললি? এটার জন্য স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধুকে ব্লেইম করবে কেন? যুদ্ধের ময়দানে এটা ছিল একজন কমান্ডারের কমান্ড। এটা অপরাধ নয়; বরং এটার জন্য তিনি ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। নির্যাতিত বাঙালিদের মুক্তির দিশারি, মহান নেতা বঙ্গবন্ধু। এভাবে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর আমরা পেলাম একটি স্বাধীন ভূখণ্ড। একটি স্বাধীন পতাকা।’

‘আমিও একমত। বঙ্গবন্ধু একদম ঠিক কাজটিই করেছেন। আচ্ছা দাদা, ঠিক একই কাজ অর্থাৎ নির্যাতিত, নিষ্পেষিত, দলিত মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য পৃথিবীর অন্য কোথাও যদি অন্য কোনো নেতা এরকম কথা বলে, তাহলে তুমি কি মনে করবে? অন্য কোনো নেতা যদি বলে– ‘শত্রুদের যেখানেই পাও, হত্যা করো। আর এই কমান্ডে উদ্বুদ্ধ হয়ে যদি নির্যাতিত মানুষগুলো যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তুমি সেটাকে কোন চোখে দেখবে?’

‘অবশ্যই আমি ওই নেতার পক্ষে থাকব এবং তার এই কথার, এই কাজের প্রশংসা করব।’ নিলুদা বললেন।

‘যেমন?’

‘যেমন আমি চে গুয়েভারার সংগ্রামকে স্বাগত জানাই, আমি যোসেফ স্ট্যালিন, মাও সে তুংয়ের সংগ্রামকে স্বাগত জানাই। এরা সবাই নির্যাতিতদের অধিকারের জন্য লড়েছেন।’

এবার সাজিদ বলল– ‘দাদা, আপনি আরবদের ইতিহাস জানেন?’

‘কীরকম?’

‘চোদ্দোশো বছর আগের কথা। আরবের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের বিপরীতে একটি নতুন ধর্মবিশ্বাস সেখানে মাথা তুলে দাঁড়ায়।’

‘হু।’

‘কিছু মানুষ স্বেচ্ছায়, কোনো রকম জোরজবরদস্তি ছাড়াই এই ধর্মটির প্রতি অনুরাগী হয়ে পড়ে। তারা দলে দলে এই ধর্মবিশ্বাস মেনে নিতে শুরু করে। কিন্তু সমাজপতিদের এটা সহ্য হয়নি। যারা যারা এই ধর্মটিকে মেনে নিচ্ছিল, তাদের উপরই নেমে আসছিল অকথ্য নির্যাতন। বুকের ওপর পাথর তুলে দেওয়া, উটের পেছনে রশি দিয়ে বেঁধে মরুভূমিতে ঘোরানো, গর্দান নিয়ে নেওয়ার মতো ঘটনাসহ আরও কত কী। একপর্যায়ে এই ধর্মের প্রচারক এবং তার সঙ্গী-সাথীদের দেশছাড়া করা হলো। এমন কোনো নির্যাতন নেই, যা তাদের ওপর নেমে আসেনি। স্বদেশহারা, স্বজনহারা হয়ে তারা তখন বিধ্বস্ত। ৭১-এ আমাদের শত্রু যেমন ছিল পাকিস্তান, ১৪০০ বছর আগের সে সময়টায় মুসলিমদের শত্রু ছিল মুশরিকরা। তাহলে এই অত্যাচার, নির্যাতনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, তাদের নেতা যদি ঘোষণা দেয়; তোমরা মুশরিকদের যেখানেই পাও, হত্যা করো, তাহলে দাদা এতে কি কোনো অপরাধ, কোনো সন্ত্রাসবাদ প্রকাশ পায়?’

নিলুদা চুপ করে আছে।

সাজিদ বলে যেতে লাগল– ‘বঙ্গবন্ধুর, “আমরা তাদের ভাতে মারব, পানিতে মারব” যদি বাঙালির মহাকাব্য হয়, এটা যদি সন্ত্রাসবাদে উসকানি না হয়, তাহলে আরেকটি যুদ্ধের ঘোষণাস্বরূপ বলা– “তোমরা মুশরিকদের যেখানেই পাও হত্যা করো” এই কথাটা কেন সন্ত্রাসবাদী কথা হবে? এটি কেন জঙ্গিবাদের উসকানি হবে?

‘হত্যার নির্দেশ দেওয়ার পরের আয়াতেই বলা আছে– “মুশরিকদের কেউ যদি তোমাদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাদের নিরাপদ স্থানে আশ্রয় দাও।”

‘আপনি চে গুয়েভারা, যোসেফ স্ট্যালিন, মাও সে তুংয়ের কথা বললেন, তাদের কেউ কি বলেছে– ‘কেউ এসে আমাদের কাছে আশ্রয় চাইলে, আমরা তাদের নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় দেবো।’ বলেছিল? বলেনি। পৃথিবীর কোনো কমান্ডারই শত্রুদের এরকম নিরাপদ আশ্রয় দেওয়ার কথা বলেনি; বরং নির্দেশ দেয়– “দেখা মাত্রই গুলি কর।”’

নিলুদা বলল– ‘হু।’

সাজিদ বলল– ‘দাদা, কুরআনে আরও আছে, “যে বিনা অপরাধে কোনো নির্দোষ ব্যক্তিকে খুন করল, সে যেন পুরো মানবজাতিকেই খুন করল।” এরকম একটি কথা, পৃথিবীর কোনো মানুষ, কোনো নেতা, কোনো গ্রন্থে কি আছে? নেই।

‘৭১-এ জালিম পাকিস্তানিদের মারার ঘোষণা দিয়ে বঙ্গবন্ধু আমাদের কাছে মহানায়ক, তাহলে ১৪০০ বছর আগে এরকম ঘোষণা আরেকজন দিয়ে থাকলে তিনি কেন খলনায়ক হবেন? অপরাধী হবেন? একই কথা, একই নির্দেশের জন্য আপনি একজনকে মহামানব মনে করেন, অন্যজনকে মনে করেন সন্ত্রাসী, কেন দাদা? স্রেফ কি ধর্ম বিরোধিতার জন্য?’

‘একজনের এরকম ঘোষণাকে ফোনের রিংটোন করে রেখেছেন, অন্যজনের এরকম ঘোষণাকে সন্ত্রাসবাদী কথাবার্তা, জঙ্গিবাদী কথাবার্তা বলে কটাক্ষ করে লেখা লিখেন, কেন? এটা কি ফেয়ার, দাদা?’

‘হুম। আসলে আমি এমন করে বলিনি।’ নিলুদা কিছুটা একমত।

সাজিদ বলল– ‘দাদা, অনেক নাস্তিককে কুরআনের একটি আয়াতকে অন্য আয়াতের সাথে কন্ট্রাডিক্টরি বলতে দেখেছি। অথচ তারা কোনোদিনও সূরা তাওবায় “তোমরা মুশরিকদের যেখানেই পাও হত্যা করো” এটাকে সূরা মায়েদার “যে নিরাপরাধ কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করল, সে যেন পুরো মানবজাতিকেই হত্যা করল” এটার সাথে কন্ট্রাডিক্টরি বলতে দেখি না।

‘অথচ সেভাবে ভাবলে, এই দুই আয়াতে দু-রকম কথা বলা হচ্ছে। একবার মেরে ফেলতে বলছে, আরেকবার বলছে, মারলে পুরো মানবজাতিকে হত্যা করার মতো চরম পাপ হবে। কিন্তু তবুও নাস্তিকরা এই দুটোকে এক পাল্লায় এনে কথা বলে না। কেন বলে না? কারণ, তারাও জানে দুটো আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই দুটোকে এক করে বলতে গেলেই নাস্তিকরা ধরা পড়বে, তাই বলে না।’

নিলুদা সব শুনলেন। শুনে বললেন– ‘এর জন্যই বুঝি মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনতে এসেছিলি?’

‘না দাদা, শুধু ডাবল স্ট্যান্ডবাজিটা উপলব্ধি করাতে এসেছি। হা হা হা।’

স্রেফ ভালো সম্পর্ক বলেই নিলুদা সেদিন রাগ করেননি হয়তো।

স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করল

ল্যাম্পপোস্টের অস্পষ্ট আলোয় একজন বয়স্ক লোকের ছায়ামূর্তি আমাদের দৃষ্টিগোচর হলো। গায়ে মোটা একটি শাল জড়ানো। পৌষের শীত। লোকটা হালকা কাঁপছেও।

আমরা খুলনা থেকে ফিরছিলাম। আমি আর সাজিদ। স্টেশন মাস্টারের রুমের পাশের একটি বেঞ্চিতে লোকটা আঁটসাঁট হয়ে বসে আছে। স্টেশনে এরকম কত লোকই তো বসে থাকে। তাই সেদিকে আমার বিশেষ কোনো কৌতূহল ছিল না। কিন্তু সাজিদকে দেখলাম সেদিকে এগিয়ে গেল।

লোকটার কাছে গিয়েই সাজিদ ধপাস করে বসে পড়ল। আমি দূর থেকে খেয়াল করলাম, লোকটার সাথে সাজিদ হেসে হেসে কথাও বলছে।

আশ্চর্য! খুলনার স্টেশন। এখানে সাজিদের পরিচিত লোক কোথা থেকে এলো? তা ছাড়া লোকটিকে দেখে বিশেষ কেউ বলেও মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে কোনো বাদাম বিক্রেতা। বাদাম বিক্রি শেষে প্রতিদিন ওই জায়গায় বসেই হয়তো রাত কাটিয়ে দেয়।

আমাদের রাতের ট্রেন। এখন বাজে রাত দুইটা। এই সময়ে সাজিদের সাথে কারও দেখা করার কথা থাকলে তা তো আমি জানতামই। অদ্ভুত!

আমি আরেকটু এগিয়ে গেলাম। একটু অগ্রসর হতেই দেখলাম, ভদ্রলোকের হাতে একটি বইও আছে। দূর থেকে আমি বুঝতে পারিনি। সাজিদ আমাকে ইশারা দিয়ে ডাকল। গেলাম।

লোকটার চেহারাটা বেশ চেনাচেনা লাগছে, কিন্তু সঠিক মনে করতে পারছি না।

সাজিদ বলল– 'এইখানে বস। ইনি হচ্ছেন হুমায়ুন স্যার।'

হুমায়ুন স্যার? এই নামের কোনো স্যারকে তো আমি চিনি না। সাজিদকে জিজ্ঞেস করতে যাব যে কোন হুমায়ুন স্যার, অমনি সাজিদ আবার বলল– 'হুমায়ুন রুবায়েত আজাদকে চিনিস না? ইনি আর কী।'

এরপর সে লোকটার দিকে ফিরে বলল– 'স্যার, এ হলো আমার বন্ধু, আরিফ।'

লোকটা আমার দিকে তাকাল না। সাজিদের দিকে তাকিয়ে আছে। ঠোঁটে মৃদু হাসি।

আমার তখনো ঘোর কাটছেই না। কী হচ্ছে এসব? আমিও ধপাস করে সাজিদের পাশে বসে গেলাম।

সাজিদ আর হুমায়ুন রুবায়েত আজাদ নামের লোকটার মধ্যে আলাপ হচ্ছে। এমনভাবে কথা বলছে, যেন তারা পরস্পর পরস্পরকে অনেক আগে থেকেই চেনে।

লোকটা সাজিদকে বলছে– 'তোকে কত করে বলেছি, আমার লেখা *আমার অবিশ্বাস* বইটা ভালোমতো পড়তে। পড়েছিলি?'

সাজিদ বলল– 'হ্যাঁ স্যার। পড়েছি তো।'

'তাহলে আবার আস্তিক হয়ে গেলি কেন? নিশ্চয় কোনো ত্যাঁদড়ের ফাঁদে পড়েছিস? কে সে? নাম বল? পেছনে যে আছে– কী জানি নাম?'

'আরিফ'।

'হ্যাঁ, এই ত্যাঁদড়ের ফাঁদে পড়েছিস বুঝি? দাঁড়া, তাকে আমি মজা দেখাচ্ছি।'

এই বলে লোকটা বসা থেকে উঠতে গেল।

সাজিদ জোরে বলে উঠল– 'না না স্যার। ও কিচ্ছু জানে না।'

'তাহলে?'

'আসলে স্যার, বলতে সংকোচ বোধ করলেও সত্য এটাই যে, নাস্তিকতার ওপর আপনি যেসব লজিক দেখিয়েছেন, সেগুলো এতটাই দুর্বল যে, নাস্তিকতার ওপর আমি বেশি দিন ঈমান রাখতে পারিনি।'

এটুকু বলে সাজিদ মাথা নিচু করে ফেলল।

লোকটার চেহারাটা মুহূর্তেই রুক্ষ ভাব ধারণ করল। বলল– 'তার মানে বলতে চাইছিস, তুই এখন আমার চেয়েও বড়ো পণ্ডিত হয়ে গেছিস? আমার চেয়েও বেশি পড়ে ফেলেছিস? বেশি বুঝে ফেলেছিস?'

সাজিদ তখনও মাথা নিচু করে আছে।

লোকটা বলল– 'যাকগে! একটা সিগারেট খাব। ম্যাচ নেই। তোর কাছে আছে?'

'জি স্যার।' এই বলে সাজিদ ব্যাগ খুলে একটি ম্যাচ বের করে লোকটার হাতে দিলো। সাজিদ সিগারেট খায় না। তবে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো তার ব্যাগে থাকে সবসময়।

লোকটা সিগারেট ধরাল। কয়েকটা জোরে জোরে টান দিয়ে ফুঁস করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল। ধোঁয়াগুলো মুহূর্তেই কুণ্ডুলি আকারে স্টেশন মাস্টারের ঘরের রেলিং বেয়ে উঠে যেতে লাগল। আমি সেদিকে তাকিয়ে আছি।

লোকটার কাশি উঠে গেল। কাশতে কাশতে লোকটা বসা থেকে উঠে পড়ল। এই মুহূর্তে ওনার সিগারেট খাওয়ার আর ইচ্ছে নেই সম্ভবত। লোকটা সিগারেটের টুকরো নিচে ফেলে পা দিয়ে একটি ঘষা দিলো। অমনি সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরোটি থেঁতলে গেল।

সাজিদের দিকে ফিরে লোকটা বলল– 'তাহলে এখন বিশ্বাস করিস যে স্রষ্টা বলে কেউ আছে?'

সাজিদ হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

‘স্রষ্টা এই বিশ্বলোক, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন বলে বিশ্বাস করিস তো?’

আবারও সাজিদ হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

এবার লোকটা একটা অদ্ভুত রকম হাসি দিলো। এই হাসি এতটাই বিদঘুটে ছিল যে, তাতে আমার গা ছমছম করে উঠল।

লোকটি বলল– ‘তাহলে বল দেখি, স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করল?’

এই প্রশ্নটি করে লোকটি আবার সেই বিদঘুটে হাসিটা হাসল।

সাজিদ বলল– ‘স্যার, বাই ডেফিনিশন, স্রষ্টার কোনো সৃষ্টিকর্তা থাকতে পারে না। যদি বলি “ক” সৃষ্টিকর্তাকে সৃষ্টি করেছে, তৎক্ষণাৎ আবার প্রশ্ন উঠবে, তাহলে “ক”-এর সৃষ্টিকর্তা কে? তখন যদি বলি “ক”-এর সৃষ্টিকর্তা “খ”, তাহলে আবার প্রশ্ন উঠবে “খ”-এর সৃষ্টিকর্তা কে? এভাবে চলতেই থাকবে। কোনো সমাধানে যাওয়া যাবে না।’

লোকটি বলল– ‘সমাধান আছে।’

‘কী সেটা?’

‘মেনে নেওয়া যে, স্রষ্টা নেই, ব্যস!’, এটুকু বলে লোকটি আবার হাসি দিলো। হা হা হা হা।

সাজিদ আপত্তি জানাল। বলল– ‘আপনি ভুল, স্যার।’

লোকটি চোখ কপালে তুলে বলল– ‘কি? আমি, আমি ভুল?’

‘জি স্যার।’
‘তাহলে বল দেখি, স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করল? উত্তর দে। দেখি কত বড়ো জ্ঞানের জাহাজ হয়েছিস তুই।’

আমি বুঝতে পারলাম, এই লোক সাজিদকে যুক্তির গ্যাঁড়াকলে ফেলার চেষ্টা করছে।

সাজিদ বলল– ‘স্যার, গত শতাব্দীতেও বিজ্ঞানীরা ভাবতেন, এই মহাবিশ্ব অনন্তকাল ধরে আছে। মানে এটার কোনো শুরু নেই। তারা আরও ভাবত, এটার কোনো শেষও নেই। তাই তারা বলত যেহেতু এটার শুরু-শেষ কিছুই নেই, সুতরাং, এটার জন্য একটা সৃষ্টিকর্তারও দরকার নেই। কিন্তু থার্মোডাইনামিক্সের তাপ ও গতির সূত্রগুলো আবিষ্কার হওয়ার পর এই ধারণা পুরোপুরি ভ্যানিশ তো হয়ই, সাথে পদার্থবিজ্ঞানেও ঘটে যায় একটা বিপ্লব। থার্মোডাইনামিক্সের তাপ ও গতির দ্বিতীয় সূত্র বলছে– এই মহাবিশ্ব ক্রমাগত ও নিরবচ্ছিন্ন উলটাপ অস্তিত্ব থেকে পর্যায়ক্রমে উলটাপহীন অস্তিত্বের দিকে ধেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই সূত্রকে উলটো থেকে প্রয়োগ কখনোই সম্ভব নয়। অর্থাৎ কম উলটাপ অস্তিত্ব থেকে এটাকে বেশি উলটাপ অস্তিত্বের দিকে নিয়ে যাওয়া আদৌ সম্ভব নয়। এই ধারণা থেকে প্রমাণ হয়, মহাবিশ্ব চিরন্তন নয়। এটা অনন্তকাল ধরে এভাবে নেই।

এটার একটা নির্দিষ্ট শুরু আছে। থার্মোডাইনামিক্সের সূত্র আরও বলে, এভাবে চলতে চলতে একসময় মহাবিশ্বের সকল শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর মহাবিশ্ব ধ্বংস হবে।'

লোকটি বলল– 'উফ! আসছেন বৈজ্ঞানিক লম্পু। সহজ করে বল ব্যাটা।'

সাজিদ বলল– 'স্যার, একটা গরম কফির কাপ টেবিলে রাখা হলে, সেটা সময়ের সাথে আস্তে আস্তে তাপ হারাতে হারাতে ঠান্ডা হতেই থাকবে। কিন্তু সেটা টেবিলে রাখার পর যে পরিমাণ গরম ছিল, সময়ের সাথে সাথে সেটা আরও বেশি গরম হয়ে উঠবে– এটা অসম্ভব। এটা কেবল ঠান্ডাই হতে থাকবে। একটা পর্যায়ে গিয়ে দেখা যাবে, কফির কাপটা সমস্ত তাপ হারিয়ে একেবারে ঠান্ডা হয়ে গেছে। এটাই হচ্ছে থার্মোডাইনামিক্সের সূত্র।'

'হুম, তো?'

'এর থেকে প্রমাণ হয়, মহাবিশ্বের একটা শুরু আছে। মহাবিশ্বের যে একটা শুরু আছে– তারও প্রমাণ বিজ্ঞানীরা পেয়েছে। মহাবিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্বের ওপর এ যাবৎ যতগুলো থিওরি বিজ্ঞানী মহলে এসেছে, তন্মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও প্রমাণের দিক থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী থিওরি হলো– বিগব্যাং থিওরি। বিগব্যাং থিওরি বলছে– 'মহাবিশ্বের জন্ম হয়েছে একটি বিস্ফোরণের ফলে। তাহলে স্যার, এটা এখন নিশ্চিত যে, মহাবিশ্বের একটি শুরু আছে।'

লোকটা হ্যাঁ– সূচক মাথা নাড়ল।

সাজিদ আবার বলতে শুরু করল– 'স্যার, আমরা সহজ সমীকরণ পদ্ধতিতে দেখব স্রষ্টাকে সৃষ্টির প্রয়োজন আছে কি না, মানে স্রষ্টার সৃষ্টিকর্তা থাকতে পারে কি না।

'সকল সৃষ্টির একটা নির্দিষ্ট শুরু আছে এবং শেষ আছে; ধরি, এটা সমীকরণ ১।

মহাবিশ্ব একটি সৃষ্টি; এটা সমীকরণ ২।

এখন সমীকরণ ১ আর ২ থেকে পাই–

সকল সৃষ্টির শুরু এবং শেষ আছে। মহাবিশ্ব একটি সৃষ্টি, তাই এটারও একটা শুরু এবং শেষ আছে।

'তাহলে আমরা দেখলাম; 'ওপরের দুটো শর্ত পরস্পর মিলে গেল এবং তাতে থার্মোডাইনামিক্সের তাপ ও গতির সূত্রের কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি।'

'হু'

'আমার তৃতীয় সমীকরণ হচ্ছে : 'স্রষ্টা সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।'

তাহলে খেয়াল করুন, আমার প্রথম শর্তের সাথে কিন্তু তৃতীয় শর্ত ম্যাচ হচ্ছে না।

‘আমার প্রথম শর্ত ছিল : সকল সৃষ্টির শুরু আর শেষ আছে। কিন্তু তৃতীয় শর্তে কথা বলছি স্রষ্টা নিয়ে। তিনি সৃষ্টি নন, তিনি স্রষ্টা। তাই এখানে প্রথম শর্ত খাটে না। সাথে, তাপ ও গতির সূত্রটিও এখানে আর খাটছে না। তার মানে, স্রষ্টার শুরুও নেই, শেষও নেই। অর্থাৎ, তাকে নতুন করে সৃষ্টিরও প্রয়োজন নেই। তার মানে স্রষ্টার আরেকজন স্রষ্টা থাকারও প্রয়োজন নেই। তিনি অনাদি, অনন্ত।’

এতটুকু বলে সাজিদ থামল। হুমায়ুন আজাদ নামের লোকটি কপালের ভাঁজ দীর্ঘ করে বললেন– ‘কী ভংচং বোঝালি এগুলো? কী সব সমীকরণ-টমীকরণ? এসব কী? সোজা-সাপ্টা বল। আমাকে অঙ্ক শেখাচ্ছিস? Laws of Causality সম্পর্কে ধারণা আছে? Laws of Causality মতে, সবকিছুর পেছনে একটা Cause বা কারণ থাকে। সেই সূত্রমতে, স্রষ্টার পেছনেও একটা কারণ থাকতে হবে।’

সাজিদ বলল– ‘স্যার, উত্তেজিত হবেন না প্লিজ। আমি আপনাকে অঙ্ক শেখাতে যাব কোন সাহসে? আমি শুধু আমার মতো ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করেছি।’

‘কচু করেছিস তুই। Laws Of Causality দিয়ে ব্যাখ্যা কর।’ লোকটা উচ্চস্বরে বলল।

‘স্যার, Laws Of Causality বলবৎ হয় তখনই, যখন থেকে Time, Space এবং Matter জন্মলাভ করে, ঠিক না? কারণ, আইনস্টাইনের থিওরি অফ রিলেটিভিটিও স্বীকার করে যে– Time জিনিসটা নিজেই Space আর Matter-এর সাথে কানেক্টেড। Cause-এর ধারণা তখনই আসবে, যখন Time, Space, Matter এই ব্যাপারগুলো তৈরি হবে। তাহলে যিনিই এই Time, Space, Matter-এর স্রষ্টা, তাকে কী করে আমরা Time-Space-Matter-এর বাটখারাতে বসিয়ে Laws Of Causality দিয়ে বিচার করব, স্যার? এটা তো লজিক বিরুদ্ধ, বিজ্ঞানবিরুদ্ধ।’

লোকটা চুপ করে আছে। কিছু হয়তো বলতে যাচ্ছিল। এর মধ্যেই আবার সাজিদ বলল– ‘স্যার, আপনি Laws Of Causality-এর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, সেটা ভুল।’

লোকটা আবার রেগে গেল। রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলল– ‘এই ছোঁকড়া! আমি ভুল বলেছি মানে কী? তুই কি বলতে চাস আমি বিজ্ঞান বুঝি না?’

সাজিদ বলল– ‘না না স্যার, একদম তা বলিনি। আমার ভুল হয়েছে। আসলে, বলা উচিৎ ছিল যে, Laws Of Causality-এর সংজ্ঞা বলতে গিয়ে আপনি ছোট্ট একটা জিনিস মিস করেছেন।’

লোকটার চেহারা এবার একটু স্বাভাবিক হলো। বলল– ‘কী মিস করেছি?’

‘আপনি বলেছেন, Laws Of Causality মতে, সবকিছুরই একটি Cause থাকে। আসলে এটা স্যার সেরকম নয়। Laws Of Causality হচ্ছে; Everything which has a beginning has a cause অর্থাৎ, এমন সবকিছু, যেগুলোর একটা নির্দিষ্ট শুরু আছে, কেবল তাদেরই Cause থাকে। স্রষ্টার কোনো শুরু নেই, তাই স্রষ্টাকে Laws Of Causality দিয়ে মাপাটা যুক্তি এবং বিজ্ঞানবিরুদ্ধ।’

লোকটার মুখ কিছুটা গম্ভীর হয়ে গেল। বলল– 'তুই কি ভেবেছিস, এরকম ভারী ভারী কিছু শব্দ ব্যবহার করে কথা বললেই আমি তোর যুক্তি মেনে নেব? অসম্ভব।'

সাজিদ এবার মুচকি হাসল। হেসে বলল– 'স্যার, আপনার হাতে একটি বই দেখছি। ওটা কী বই?'

'এটা আমার লেখা বই : *আমার অবিশ্বাস*।'

'স্যার, ওটা আমাকে দেবেন একটু?'

'এই নে, ধর।'

সাজিদ বইটা হাতে নিয়ে উলটাল। উলটাতে উলটাতে বলল– 'স্যার, এই বইয়ের কোন লাইনে আপনি আছেন?'

লোকটা ভ্রু কুঁচকে বলল– 'মানে?'

'বলছি, এই বইয়ের কোন অধ্যায়ের, কোন পৃষ্ঠায়, কোন লাইনে আপনি আছেন?'

'তুই অদ্ভুত কথা বলছিস। আমি বইয়ে থাকব কেন?'

'কেন থাকবেন না? আপনি এর স্রষ্টা না?'

'হ্যাঁ।'

'এই বইটা কালি আর কাগজ দিয়ে তৈরি। আপনিও কী কালি আর কাগজ দিয়ে তৈরি স্যার?'

'খুবই স্টুপিডিটি টাইপ প্রশ্ন। আমি এই বইয়ের স্রষ্টা। এই বই তৈরির সংজ্ঞা দিয়ে কি আমাকে ব্যাখ্যা করা যাবে?'

সাজিদ আবার হেসে দিলো। বলল– 'না স্যার। এই বই তৈরির যে সংজ্ঞা, সে সংজ্ঞা দিয়ে মোটেও আপনাকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। ঠিক সেভাবে, এই মহাবিশ্ব যিনি সৃষ্টি করেছেন, তাঁকেও তাঁর সৃষ্টির Time-Space-Matter-Cause এসব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না।

'আপনি কালি, কলম বা কাগজের তৈরি নন, তার ঊর্ধ্বে। কিন্তু আপনি Time-Space-Matter-Cause-এর ঊর্ধ্বে নন। আপনাকে এগুলো দিয়ে ব্যাখ্যা করাই যায়। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন এমন একজন, যিনি নিজেই Time-Space-Matter-Cause-এর সৃষ্টিকর্তা। তাই তাঁকে Time-Space-Matter-Cause দিয়ে পরিমাপ করা যাবে না। অর্থাৎ তিনি এসবের ঊর্ধ্বে। তার কোনো Time-Space-Matter-Cause নেই। তার কোনো শুরু-শেষ নেই। অর্থাৎ তাঁর কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই।'

লোকটা উঠে দাঁড়াল। দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল– 'ভালো ব্রেইনওয়াশড! ভালো ব্রেইনওয়াশড! আমরা কি এই তরুণ প্রজন্ম চেয়েছিলাম? হায়! আমরা কি এই তরুণ প্রজন্ম চেয়েছিলাম?'

এটা বলতে বলতে লোকটা হাঁটা ধরল। দেখতে দেখতেই উনি স্টেশনে মানুষের ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তেই আমার ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙার পর আমি কিছুক্ষণ ঝিম মেরে ছিলাম। ঘড়িতে সময় দেখলাম– রাত দেড়টা বাজে। সাজিদের বিছানার দিকে তাকালাম। দেখলাম, সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বই পড়ছে। আমি উঠে তার কাছে গেলাম। গিয়ে দেখলাম সে যে বইটা পড়ছে, সেটার নাম; *আমার অবিশ্বাস*। বইয়ের লেখক– হুমায়ুন আজাদ।

সাজিদ বই থেকে মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল। তার ঠোঁটের কোনায় একটি অদ্ভুত হাসি।

আমি বিরাট একটা শক খেলাম। নাহ! এটা হতে পারে না। স্বপ্নের ওপর কারও হাত নেই; আমি বিড়বিড় করে বলতে লাগলাম।

গার্ডিয়ান
প া ব লি কে শ ন স
৩৪, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০।
www.facebook.com/guardianpubs

ISBN : 978-984-92959-0-7